সোনার শাঁখা

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত
প্রণীত।

শ্রাবণ—১৩৩৯।

শিশির পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

মূল্য ১৲ মাত্র।

প্রকাশক—

শ্রীশিশির কুমার মিত্র বি, এ,

শিশির পাব্লিশিং হাউস,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার—আবদুল গফুর

নিউ ব্রিটানিয়া প্রেস,

[illegible], অপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা।

সোনার শাঁখা

১

ডগমগপুরের ষ্টেশনমাষ্টার সিদ্ধেশ্বর মিত্র রাত্রি সাড়ে আট-টার শেষ ট্রেণখানিকে 'পাস' করিয়া দিয়া, ষ্টেশনের ক্ষুদ্র কক্ষটার মধ্যে বসিয়া হিসাব ক্লোজ করিতেছিলেন।

কার্ত্তিক মাস হইলেও শীতের হাওয়া ইহারই মধ্যে বেশ তীব্র ভাবে বহিতে সুরু করিয়াছিল, তাহার উপর আবার অপরাহ্নে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া হাওয়ার তেজটাকে আরও তীব্র করিয়া তুলিয়াছিল। আকাশে তখনও মেঘ ছিল, তাহারই আবরণ হইতে উভয় পার্শ্বস্থ সিগনালের আলো দুইটী নক্ষত্র বর্জ্জিত কালো আকাশের গায়ে দুটী বড় বড় রক্ত-সিন্দুর মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ডগমগপুর ষ্টেশনটী ই, আই, রেলের চুনার ও মির্জাপুরের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশন। ষ্টেশনমাষ্টার সিদ্ধেশ্বরবাবু, দিয়াশ্লে-

লাল নামা পশ্চিমদেশীয় এক ব্যক্তি এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশনমাষ্টার ও সিগনলার ও দুই জন খালাসী লইয়াই ষ্টেশনের 'ষ্টাফ'। সিদ্ধেশ্বরবাবু প্রায় দুই বৎসরের অধিক কাল এইখানে আসিয়াছেন। স্থানটী ক্ষুদ্র হইলেও বেশ স্বাস্থ্যকর, জিনিষ পত্রও সস্তা, টাকায় দশ সের করিয়া খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।

নানা কারণে সেদিন তাঁহার মনটা বড় প্রসন্ন ছিল না। চাকরীর খাতিরে এই বৈচিত্রহীন জীবনের দিনগুলি নিয়মিত ভাবে টিকিট বিক্রয় ও মাল ওজন করিয়া এক প্রকার নীরবে কাটিয়া যাইত, কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলি ছোট বড় ব্যাপারে তাঁহার মনের শান্তি একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। স্ত্রী বহুদিন হইতে কাশ রোগে ভুগিতেছিলেন, এবার তাহা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে. একটীমাত্র কন্যা—সেও বিধবা হইয়া তাঁহার নিকট রহিয়াছে, এক ব্যক্তির নিকট কয়েকটি টাকা ধার করিয়াছিলেন, যথাসময়ে তাহা না দিতে পারায় সে ব্যক্তি কতকগুলি রূঢ় কথা বলিয়া গিয়াছে।

ইহার উপর আবার কি একটা তুচ্ছ কারণে কয়েক দিন পূর্ব্বে একখানি মালগাড়ী ভগমগপুরে অকারণ কয়েক মিনিট লেট হইয়াছে বলিয়া ট্রাফিক সুপারিণটেণ্ডেণ্টের আফিস হইতে তাঁহার এক কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছে। চিন্তার আর অবধি নাই!

মনের হাওয়াটা বড়ই এলোমেলো বহিতেছিল বলিয়া সিদ্ধেশ্বরবাবু সেদিন আর কোন কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না। একখানি বৃহদাকারের খাতা লইয়া হিসাব ঠিক করিতে বসিলেন, কিন্তু তাহা ভাল লাগিল না বলিয়া রাখিয়া দিয়া, সাহেবের নিকট যে 'এক্সপ্ল্যানেশন' লিখিতে হইবে তাহারই একটা মুসাবিদা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাও হইয়া উঠিল না। তিনি তখন বিরক্ত হইয়া কাগজ পেন্সিল রাখিয়া দিয়া দেওয়ালস্থিত ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে—ইহারই মধ্যে নয়টা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইয়া গিয়াছে।

সিদ্ধেশ্বরবাবু তখন ছোটবাবু পিয়ারেলাল ও ডিউটী খালাসী রামভরণকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বাসায় যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।

ঠিক এই সময়টাতে টিকিট দিবার ক্ষুদ্র জানালাটার লৌহ-গরাদের অপর পার্শ্ব হইতে "হর হর ব্যোম্ ব্যোম্, ব্যোম্ বাবা বিশ্বনাথজী" বলিতে বলিতে এক ব্যক্তি ষ্টেশনের ক্ষুদ্র কক্ষটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল যে কাশী যাইবার ট্রেণ কখন?

সিদ্ধেশ্বরবাবু চাহিয়া দেখিলেন যে প্রশ্নকর্ত্তা এক সন্ন্যাসী। তাঁহার পরিধানে একটা গেরুয়া রংয়ের আলখাল্লা, মাথায়

একটা গেরুয়া পাগড়ী, গোঁফ দাড়ি কামান, সাধারণ সন্ন্যাসীদের মত গায়ে ভস্মও নাই, মাথায় জটাও নাই।

সন্ন্যাসীর প্রশ্নের উত্তরে ছোট বাবু পেয়ারেলাল জানাইলেন যে ডাউনের শেষ ট্রেণ সেদিন চলিয়া গিয়াছে, কাশী যাইতে হইলে পরদিন প্রাতে সাড়ে আটটা ভিন্ন আর উপায় নাই।

সিদ্ধেশ্বরবাবু সে বিষয়ে আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু প্ল্যাটফরম হইতে বাহিরের রাস্তায় নামিবার ক্ষুদ্র ফটকটীর সিঁড়ির ধাপে সবেমাত্র পা দিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে সেই সন্ন্যাসীটী পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছেন।

সিদ্ধেশ্বরবাবু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট আসিয়া পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলিলেন, "মশাই, দেখছি আপনি বাঙ্গালী আমিও তাই। এখানে গ্রামের মধ্যে কোথাও এই রাত্তিরটুকুর মত একটু থাকবার জায়গা হতে পারে? সন্ন্যাসী মানুষ দেখছেন তো, কাশী যাব, কিন্তু ট্রেণ নেই। তার ওপর আবার শরীরটাও ভাল নেই।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু যথেষ্ট বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিলেন। এই সুদূর প্রবাসে, হিন্দুস্থানীর দেশে, একজন বাঙ্গালী—আবার যে সে বাঙ্গালী নহে, একজন বাঙ্গালী সাধু-পুরুষ দেখিয়া তাঁহার মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া গেল। বলিলেন,

"এখানে তো অন্য আশ্রয় নেই, সামান্য গ্রাম, সবাই হিন্দুস্থানী। তবে আপনি যদি দয়া করে আমার কুঁড়েয় পায়ের ধূলো দেন, তা হলে—"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বড় ভাল হয় তা হলে। আঃ যে উপকার কল্লেন আজ! তা নইলে এই ঠাণ্ডায়, অসুস্থ শরীরে, একেবারে মারা পড়তে হতো। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিলেন, ভগবান নিশ্চয় আপনার ভাল করবেন।

সিদ্ধেশ্বরবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে সে কি কথা! আপনারা মহাপুরুষ লোক, আপনাদের পায়ের ধূলো আমাদের কুঁড়েয় পড়বে এ তো ভাগ্যির কথা।" বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, সন্ন্যাসী তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সিদ্ধেশ্বরবাবুর বাসাটী ষ্টেশন হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে। রেলওয়ে হইতে তাঁহাকে যে 'কোয়াটার্স' দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্ব অধিবাসী একজন মুসলমান ছিল বলিয়া সিদ্ধেশ্বর-বাবু তাহা ব্যবহার করেন নাই; গ্রামের মধ্যে একটী ছোট বাড়ী দেখিয়া লইয়াছিলেন, তজ্জন্য প্রতিমাসে তাঁহাকে দুই টাকা করিয়া ভাড়া দিতে হইত।

পথে আসিতে আসিতে সন্ন্যাসী জানাইলেন যে তিনি হরিদ্বার, কঙ্খল, প্রভৃতি ঘুরিয়া মৃজাপুরে আসিয়াছিলেন। সেখান হইতে পদব্রজে চুনারে আসিয়া, তথা হইতে কাশী

যাইবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু পথে শরীর অসুস্থ হওয়ায় সে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, রেলে বরাবর কাশী যাইতেই মনস্থ করিয়া ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন, কিন্তু গাড়ী পাইলেন না।

সিদ্ধেশ্বরবাবু সন্ন্যাসীর পদার্পণে নিজের সৌভাগ্য জানাইয়া সসঙ্কোচে বলিলেন, "বাবাঠাকুর, অপরাধ নেবেন না। আপনাদের নাম জিজ্ঞেসা করা আমাদের শোভা পায় না। কিন্তু কি বলে আপনাকে সম্বোধন করবো? বাবাঠাকুর বলেন কি?"

বাবাঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "না। আমার সন্ন্যাস নাম হচ্ছে 'স্বামী নির্ম্মলানন্দ।' আমাকে স্বামিজী বলে ডাকতে পারেন।"

সাংসারিক নানা সুখ দুঃখের কথা বলিতে বলিতে সিদ্ধেশ্বর বাবু তাঁহার বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "স্বামীজি এইটুকু আমার কুঁড়ে। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি বাড়ীর ভেতর গিয়ে দোর খুলে দিচ্ছি।"

সিদ্ধেশ্বরবাবুর দোর খুলিতে প্রায় দশ মিনিট দেরী হইল। বাড়ীর ভিতর যাইয়া স্ত্রী ও কন্যাব নিকট স্বামীজির বর্ণনা করিতে কিছু সময় লাগিয়াছে, এবং ঘরটীর বিশৃঙ্খল বিছানাগুলিকে তাড়াতাড়ি একটু শ্রীসম্পন্ন করিতেও কিছু সময় অতিবাহিত হইল।

স্বামীজি ঘরে ঢুকিলে সিদ্ধেশ্বরবাবু অতি বিনীতভাবে

বলিলেন, "স্বামীজি, ওই চালাটার মধ্যে একটা উন্থন আছে, এখনি পরিষ্কার করিয়ে দিচ্ছি, ওখানে কাঠ দিচ্ছি, ময়দা দিচ্ছি, বেশী দেরী হবে না, তারপর আপনি করে নেবেন'খন। আমরা বরং দুটী প্রসাদ পাবো।"

স্বামীজি বলিলেন, "ছিঃ ও কথা বলবেন না। আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনি আমার পাতে প্রসাদ পাবো বল্লে যে আমার অকল্যাণ করা হয়।"

সিদ্ধেশ্বর বাবু যথেষ্ট বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, "সে কি বাবাঠাকুর, আমরা কায়েস্থ।"

স্বামীজি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমি যে চণ্ডাল নই, তাই বা কি করে জানলেন। ও সব প্রেজুডিস্ আমার নেই। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার কোনখান থেকে বেরিয়েছে, আর কায়স্থই বা কোথা থেকে বেরিয়েছে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে খাওয়া দাওয়ার বিচার করবার ইচ্ছেও আমার নেই, সময়ও নেই।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু বলিলেন, "সে কি বাবাঠাকুর। তাতে যে আমাদের মহাপাপ হবে। ছিঃ ছিঃ। আপনি মহাপুরুষ, আপনি সবই বলতে পারেন, কিন্তু আমরা সামান্য লোক, আমরা কি ও সব কথা উচ্চারণ কত্তে পারি? জিভ খসে পড়বে যে!

স্বামীজি বলিলেন, "কিছু হবে না। আপনারা যা রেঁধে-ছেন, তাই আমাকে দেবেন, আমি তাই খাবো। এতে কোন দোষ হবে না। আমার শরীরটাও আজ ভাল নেই, তার উপর আবার আগুণের তাত লাগিয়ে যদি এখন রুটী তৈয়ারী করতে যাই, তা হলে দেহ একেবারে ভেঙ্গে পড়বে।"

অগত্যা আহার সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইল। সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রী যাহা রন্ধন করিয়াছিলেন, স্বামীজি তাহাই পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিলেন। সেই কক্ষের মেজেয় কম্বল পাতিয়া বিছানা করিয়া দেওয়া হইল, স্বামীজি তাহাতে শয়ন করিলেন।

(২)

পরদিন প্রাতে সিদ্ধেশ্বর বাবু ষ্টেশনে যাইবার সময় আসিয়া দেখিলেন যে তখনও স্বামীজির নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। ঘুম ভাঙ্গাইবেন কিনা তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া, একটু উচ্চস্বরে কাশির শব্দ করিবামাত্র দেখিলেন যে, স্বামীজি মুখের আবরণ সরাইয়া দিয়া চক্ষু চাহিয়াছেন।

সিদ্ধেশ্বর বাবু বলিলেন, 'স্বামীজি, উঠতে আজ্ঞা হোক। ডাউন প্যাসেঞ্জার ৮টা পঁচিশে আমাদের এখানে 'ডিউ', এখন প্রায় পৌনে সাতটা। এই বেলা হাত মুখ ধুয়ে—"

স্বামীজি গাত্রোত্থান না করিয়াই বলিলেন, "উঃ ওঠবার শক্তি আর নেই মশাই। কাল রাত্তিরে আপনাকে বলেছিলাম

যে শরীরটা একটু যেন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেটা আর পরে গ্রাহ্য করলাম না, তাইতেই বিভ্রাটটা ঘটেছে আর কি! উঃ শেষ রাত্তির থেকে ভীষণ জ্বর এসেছে। একেবারে 'হাই ফিবার'। কথা কইবার শক্তিটা পর্য্যন্ত নেই। উঃ কাল রাত্তিরে যদি রুটী না খেয়ে একটু সাবু খেতাম, তা হলেও হোত। উঃ বাপরে!"

সিদ্ধেশ্বর বাবু দেখিলেন যে স্বামীজির কথা অপ্রকৃত নয়। চক্ষু দুইটী জবাফুলের মত লাল হইয়াছে, মুখ একেবারে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দেখিয়া তাঁহার মনে বড় ভয় হইল। বলিলেন, "তাইতো উপায়!"

স্বামীজি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "একটু সাম্‌লে না উঠলে কি করে যাই তাই ভাবছি। এই অবস্থায় রেলে উঠলে হয়তো পথের মাঝখানে অজ্ঞান টজ্ঞান হয়ে গিয়ে——"

বাধা দিয়া সিদ্ধেশ্বরবাবু বলিলেন, "না না, সে কি কথা? এ অবস্থায় যাবেন কি করে? আপনি ভাল হোন, ঈশ্বরেচ্ছায় সেরে উঠুন, তারপর যাবেন। তাড়াতাড়ি কি?

স্বামীজি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ডাক্তার আছে আপনাদের এ গ্রামে?"

সিদ্ধেশ্বরবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে না, এখানে ডাক্তার কোথায়? তবে একজন হকিম আছে, মুসলমান, গাছ গাছড়া

দিয়ে চিকিৎসা করে। আমার কিন্তু তার উপর তত বিশ্বাস নেই। চুণারে কিন্তু বেশ ভাল ডাক্তার আছে।"

স্বামীজি বলিলেন, "থাক্‌গে, আর কাজ নেই ডাক্তারে। উঃ বড় কষ্ট হচ্ছে কিন্তু।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু বলিলেন, "তাইতো বড়ই ভাবনার কথা যে দেখতে পাই। আমাকে আবার ষ্টেশনে যেতে হবে। তা, আমার এ বাড়ী আপনি নিজের বলে মনে করবেন, যখন যা দরকার, তা বলবেন। বাড়ীর ভিতরেও আমি বলে যাচ্ছি, আমার পরিবার আছেন, মেয়েটী আছে, তারা সর্ব্বদাই আপনাকে দেখবে শুনবে, কোন কষ্ট হবে না। ভয় কি, ও একটু পিত্তির জ্বর, খুব রৌদ্রে ঘোরা ফেরা করা হয়েছিল কি না, তাই হয়েছে, সেরে যাবে'খন।

স্বামীজি বলিলেন, "এক রাত্রের জন্য আপনাদের নিয়ে শুধু শুধু কষ্ট দিলাম।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু ব্যস্তভাবে বলিলেন, "সে কি কথা। কষ্ট কিসের? আপনি সাধু সন্ন্যাসী মানুষ, একদিনের জন্যে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন, আপনার অসুখের উপলক্ষে আমরা যে দুদিন আপনার সেবা যত্ন করতে পারবো, এতো আমাদের ভাগ্যি। আমি বরং ষ্টেশনে গিয়ে চুণায় টেলিফোন করে বলবো'খন যে ডাক্তারবাবু যদি বেড়াতে বেড়াতে ষ্টেশনের দিকে আসেন,

তা'হলে তিনি যেন একখানা মালগাড়ীর ব্রেকে করে এদিকে একবার ঘুরে যান। প্যাসেঞ্জার গাড়ী আর নেই কি না!"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "কিছুই করতে হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত হনগে'। এখনিই আমার সেরে যাবে! আপনার এ দয়া আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারবো না।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু বাড়ীর সকলকে স্বামীজির অসুখের কথা জানাইয়া এবং তাঁহার শুশ্রূষার যাহাতে কোন ত্রুটী না হয়, সে কথা সকলকে বিশেষ করিয়া বলিয়া ষ্টেশনে চলিয়া গেলেন।

সেবা যত্নের ত্রুটী হইল না। সিদ্ধেশ্বরবাবুর কন্যা বনমালা স্বামীজির শিয়রে বসিয়া তাঁহাকে সারা রাত্রি বাতাস করিয়া, পায়ে হাত বুলাইয়া, যথা সময়ে দুগ্ধ এবং সাবু পান করাইয়া তাঁহার অনেক শুশ্রূষা করিল, কিন্তু সেদিন তাঁহার জ্বর ছাড়িবার কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না।

অবশেষে পাঁচ দিন জ্বর ভোগের পর স্বামীজি সুস্থ হইলেন। সেদিন রাত্রে সিদ্ধেশ্বরবাবু ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে স্বামীজি লাঠির সাহায্যে পায়চারি করিতেছেন। পাঁচটী দিনের জ্বরেই তাঁহাকে একেবারে কঙ্কালসার করিয়া ফেলিয়াছে।

সিদ্ধেশ্বরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বেশ সুস্থ বোধ কচ্চেন?"

স্বামীজি ঘরের ভিতর আসিলেন, সিদ্ধেশ্বরবাবুও আসিলেন।

স্বামীজি বলিলেন, "হ্যাঁ, কাল থেকে আর জ্বর আসেনি। মশাই, এই বিদেশে, আপনারা আমার যা করেছেন, ছেলের জন্যে বাপ মাও এতটা করে কিনা সন্দেহ। আর সব চেয়ে বেশী সেবা করেছে আপনার ওই মেয়েটা। আহা মেয়েটা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আর ভগবান ওর বরাত পুড়িয়ে দিয়েছেন একেবারে। এই একটী মাত্র মেয়ে, সর্ব্বস্ব খুইয়ে বিয়ে দিয়েছিলাম, তিনটী বছরও পেরুল না।" বলিতে বলিতে সিদ্ধেশ্বরবাবুর কণ্ঠস্বর যেন একটু ভারি হইয়া উঠিল।

স্বামীজি মুখখানি বেশ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, শুনলাম আপনার পরিবারের কাছে। ভগবানের উপর আর কারু হাত নেই মশাই। যিনিই যত করুন, ওখানে গিয়েই সব ব্যবস্থাই খতম।" বলিয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইলেন।

* * * *

আরও একটু সুস্থ হইতে শরীরে বল পাইতে স্বামীজির আরও ৩৪ দিন গেল। তারপর একদিন দ্বিপ্রহরে সিদ্ধেশ্বরবাবুকে তিনি বলিলেন, "দেখুন, সন্ন্যাসী মানুষ আমি, কোন কিছুতেই বা কোন জায়গাতেই আমার আকর্ষণ থাকা উচিত নয়। আমরা

সংসার ত্যাগী কি না! কিন্তু আপনাদের এই গ্রামটাকে আমার এমন ভাল লেগেছে যে সে আর বলবার নয়। আজ সকালে বেড়াতে বেড়াতে নদীর ধারে গিয়েছিলাম, মনটার মধ্যে সেই সময় এমন একটা ভাবের উদয় হোলো, যেন মনে হতে লাগলো যে গাছপালার ভেতর দিয়ে ভগবান আমাকে বলছেন যে 'বাছা, তুই এইখানেই আশ্রয় নির্ম্মাণ কর। এই ডগমগপুরেই তোর সিদ্ধি।' ফিরে এসে সেই কথাটাই মনের মধ্যে কেবল আঁচড় পাঁচড় কচ্ছে। বিধাতার নির্ব্বন্ধ দেখুন। যাচ্ছিলাম মৃজাপুর থেকে কাশী, কিন্তু দেখুন, বরাবর রেলে না গিয়ে চুণার পর্যন্ত হেঁটে আসবার ইচ্ছাই বা হোলো কেন? আরও দেখুন, এখানে এসে ট্রেণ না পাওয়া, জ্বর হওয়া, তারপর আপনাদের আশ্রয় পাওয়া, এই সবগুলির মধ্যেই আমি যেন ভগবানের একটা ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি।"

সিদ্ধেশ্বরবাবু বলিলেন, "বেশতো সে তো খুব উত্তম কথা। আপনি যদি এখানে ডেরা স্থাপন করেন, তা'হলে গ্রামের সকলেই বোধ হয় খুব খুসী হবে। আমি আজই ষ্টেশনে আর পোষ্ট-আফিসে গিয়ে কথাটা প্রচার করে দিচ্ছি, তা'হলেই গ্রাম-ময় রাষ্ট্র হয়ে যাবে। আপনি সত্যি কথাই বলেছেন, আমিও তো রেলের চাকরী করে ছাপ্পান্ন জায়গা ঘুরেছি, কিন্তু এই ডগমগপুরটী আমারও ভারি ভাল লেগেছে।"

স্বামীজির ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে বেশী দেরী লাগিল না। গ্রামবাসীগণ অধিকাংশই হিন্দু, কাজেই তাহারা যখন শুনিল যে একজন বাঙ্গালী সাধুবাবা এখানে ডেরা স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তখন সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইল। তাহাদেরই চেষ্টায় অনতিকাল মধ্যেই গঙ্গার ধারে এক মহুয়া গাছতলায় একখানি খোলার কুটীর নির্ম্মিত হইয়া গেল, ধুনী জ্বালাইবার জন্য একটী শুষ্ক বৃক্ষ সেখানে আনীত হইল, স্বামীজি একখণ্ড গোলাকৃতি প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সিন্দুর মাখাইয়া সেই মহুয়া গাছতলায় শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই শিবলিঙ্গের নামকরণ করিলেন "ব্যোমনাথ"। প্রতি সন্ধ্যায় গীতাপাঠ হইতে লাগিল ঠাকুরের প্রসাদ ও শীতল ভক্তদের মধ্যে বিতরিত হইতে লাগিল, টাকা পয়সার প্রণামীও পড়িতে লাগিল। ক্রমে স্বামিজী হাত দেখিয়া লোকের ভবিষ্যৎ বলিতেও সুরু করিয়া দিলেন। ডগমগপুরের লোকেরা তাহার পরম ভক্ত হইয়া উঠিল। এইভাবে দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

৩

পূর্ব্বেকার ইতিহাসটি এইবার একটু প্রয়োজন।

মোক্তারপুর ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ইউনিয়ন নামা অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায়ের ক্লাব গৃহে একদিন সন্ধ্যার পর একখানি নূতন নাটকের 'রিহার্স্যাল' চলিতেছিল।

ক্লাব গৃহটী গ্রামের একখানি পরিত্যক্ত বাটীর একটী কক্ষ। তাহার দেওয়ালে রামকৃষ্ণ পরমহংসের একখানি বাঁধান ছবির উপর বহুকালের প্রদত্ত একগাছি গাঁদা ফুলের মালা তখনও ঝুলিতেছিল, এবং তাহারই তলায় মোটা মোটা অক্ষরে লাল ও কালো কালীতে লেখা ছিল, 'ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ইউনিয়ন'। দেওয়ালে বসান একটা কাঁচ বিহীন জীর্ণ আলমারির ভিতরে একটী অল্প মূল্যের হারমোনিয়ম, একটী পুরাতন বেহালা, ও একটী বাঁয়া তবলার শূন্য বৈঠক ধূলি ধূসরিত অবস্থায় পড়িয়াছিল। এবং কড়িকাঠে দড়ি বাঁধিয়া তাহাতে লম্বমান একটী বাঁচের মাচার উপর কতকগুলি 'সিন' রক্ষিত ছিল।

রিহার্স্যাল যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল, সম্রাটের ভূমিকা লইয়া নাট্যাচার্য্য রাধানাথ চৌধুরী যখন গদগদ স্বরে সাম্রাজ্ঞীর নিকট হাসিমুখে বিদায় প্রার্থনা করিয়া শত্রুর জলন্ত কামানের গোলার ভীষণত্ব বর্ণনা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়টীতে একগাছি লাঠির উপর ভর দিয়া রাধানাথের জ্যেষ্ঠতাত বিনোদবিহারী ক্লাব গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যারে রেধো!"

সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে জ্যেষ্ঠতাতকে দেখিয়া সম্রাটরূপী রাধানাথের কথাগুলি মাঝখানে আটকাইয়া গেল, সাম্রাজ্ঞী আর হাসিমুখে রাজাকে বিদায় না দিয়া, ক্লাব গৃহের পশ্চাতের দ্বার

দিয়া নিজেই সকলের অলক্ষিতে বিদায় হইলেন, এবং রাধানাথ এইমাত্র যে জলন্ত গোলার বর্ণনা করিতেছিল, তাহার প্রতিচ্ছবি জ্যেষ্ঠতাতের চক্ষের মধ্যেই দেখিতে পাইয়া বড়ই ম্রিয়মান হইয়া পড়িল।

বিনা সম্ভাষণেই বিনোদবিহারী একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বলিলেন, "রেধো, তুই একেবারে গোল্লায় গেছিস্। ছি ছি, চৌধুরী বংশে এমন পাষণ্ডও জন্মেছিল।"

ব্যাপার দেখিয়া অন্যান্য অভিনেতারাও ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বিনোদ চৌধুরী যে তাহাদের থিয়েটার ক্লাবের দুষমন, এ কথা প্রবাদ বাক্যের ন্যায় সকল মেম্বরেরই জানা ছিল।

বিনোদ বিহারী বলিলেন, "রেধো, বোস দিকিনি আমার সাম্‌নে।"

নিরীহ ভালমানুষটীর মত রাধানাথ বসিল। বিনোদবিহারী বলিলেন ত্রৈলোক্য মিত্তিরের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা কর্জ্জ করেছিলি?"

রাধানাথ নীরব। এই জ্যেষ্ঠতাতটিকে সে শৈশব হইতেই বাঘের মত ভয় করিত, সুতরাং এখনও তাঁহার কথার উপর কথা কহিবার শক্তি তাহার হইল না।

তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বিনোদবিহারী বলিলেন,—"কথা কচ্ছিস্ না যে বড়। হ্যাঁ কিনা বল।"

রাধানাথ ঘাড় না তুলিয়াই ধীরে ধীরে বলিল,—

"হাঁ।"

"তোর অংশ তার কাছে বাঁধা রেখে?"

রাধানাথকে সে কথা স্বীকার করিতে হইল। বিনোদবিহারী আবার বলিলেন,—"টাকা নিয়ে কি ক'ল্লি?"

ভালমানুষটীর মত রাধানাথ বলিল,—"সিন আর পোষাক কিনেছি।"

বারুদের স্তূপে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িল। বিনোদবিহারী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"তোমার মাথা কিনেছ হতভাগা কোথাকার! সাধ করে কি আর বলছি যে চৌধুরী বংশে এমন পাষণ্ড ও জন্মেছিল। ছিঃ—ছিঃ—কি কল্লি বল দেখি? বাপ মরে যাওয়ার পর যে তিনটে বছর পেরুইনি রে!"

রাধানাথ ঘাড় হেঁট করিয়া তখনও নীরব। বিনোদবিহারী বলিতে লাগিলেন,—"কি ভাবনায় ধার কল্লি বল দিকিনি। আর তাই যদি টাকার দরকার হ'য়েছিল, আমাকে ব'ল্লে পারতিস, কিছু দিয়ে দিতাম। তা নয় ভদ্রাসনের অর্দ্ধাংশ বাঁধা দিয়ে তুই কি সাহসে ত্রৈলক্য মিত্তিরের কাছ থেকে টাকা নিতে গেলি? বলিহারি তোর বুকের পাটা!"

এইবার রাধানাথের অসহ্য হইয়া উঠিল। সে বলিল,—"চাইলে আপনি দিতেন কিনা!"

"তাই বুঝি ভদ্রাসন বন্ধক দিতে গেলে। ছিঃ—ছিঃ—একেবারে উচ্ছন্ন গিয়েছিস্। তারপর ত্রৈলক্য মিত্তির যে নালিস করেছে, সে কথাও আমাকে জানাসনি, ডিক্রী হ'য়েছে তাও আমি জানতাম না, এই আজ সব শুনেছি। কাল যদি সে ডিক্রী জারি করে ভদ্রাসনটুকু ক্রোক ক'রে নীলেম করে, আর ওপাড়ার বছোরদ্দী সেখ এসে সেই নীলেম ডেকে নিয়ে বাড়ীর আধখানা দখল করে—তাহ'লে কেমন হয় বল দেখি?"

রাধানাথ এইবার বিচলিত হইল। বলিল,—"আপনিই কেন ডেকে নিন না।"

বিনোদবিহারী বলিলেন,—"বয়ে গিয়েছে আমার ডেকে নেবার জন্তে। বদখেয়ালিতে উড়িয়ে দেবার জন্তে যারা ভদ্রাসন বাঁধা দিয়ে টাকা ধার কত্তে পারে, তারা সব পারে। তোর মুখ দেখলেও পাপ হয়। তোর যা করবার আছে তা তুই করগে, আমারও যা করবার আছে আমি তা করবো। তোর বাপের মুখ চেয়ে ঢের সহ্য করেছি, আর নয়—" এই বলিয়া রাগে গরগর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিনোদবিহারী চলিয়া গেলেন।

করিবার মত কোন ব্যবস্থাই রাধানাথের ছিল না। তাহার

খেয়ালের প্রবৃত্তিটা যেমন ছিল, বিষয় বুদ্ধি বা সাংসারিক বুদ্ধি এই দুইটী বৃত্তিই তেমনি দুর্ব্বল ছিল। খেয়ালের নেশাটী একবার তাহার মাথায় প্রবেশ করিলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সে তাহা সম্পাদন করিতই, সে কার্য্যের পরিণামে কি আছে তাহার জন্য মাথা ঘামাইয়া কখনও সময়ের বাজে খরচ করিত না।

তাহার এই স্বভাবটীকে যদি ঠিক খেয়াল বলিয়াই ধরা যায়, তাহা হইলে হয় তো আপত্তি উঠিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রকৃতির মধ্যে যে একটু বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব ছিল, সে কথা মানিতেই হইবে এবং সেই জন্যই তাহার জীবনের কোন নির্দ্দিষ্ট গতি ছিল না। ঝরণার জলধারার মত তাহার জীবনের গতি নিত্য নূতন রাস্তা কাটিয়া বাহির হইতে চাহিত, পুকুরের বাঁধা জলের মত একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহিত না।

পাঠ্যাবস্থায় স্কুলে তাহার মত বুদ্ধিমান ও ভাল ছেলে আর দ্বিতীয় ছিল না বলিয়াই হেডমাষ্টারের ধারণা ছিল এবং তিনি যখন এই মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্রটীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানারূপ উচ্চ কল্পনা করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ সে একটা তুচ্ছ কারণে হেডপণ্ডিতের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া, স্কুলের খাতায় নাম কাটাইয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, কলিকাতায় আসিয়া

এক হোমিওপ্যাথিক স্কুলে ভর্ত্তি হইল এবং কিছুদিন চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রতি তাহার মনোযোগের প্রতি তাহার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া গেল। এই সময়ে তাহার স্কন্ধে আবার যে কোন্ দুষ্টগ্রহের সঞ্চার হইল তাহা বলা যায় না, কিন্তু দেখা গেল যে সে হোমিওপ্যাথিকের চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া কোন এক সওদাগরের আফিসে ছোলা মটর প্রভৃতি দেশের উৎপন্ন শস্য খরিদ বিক্রয়ের জন্য একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হইল। রাধানাথ তখন শস্য সংগ্রহের চেষ্টা স্থগিদ রাখিয়া বাড়ী আসিল এবং ছিলাকাটা ধনুকের মত সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্তারপুরেই পরম নিশ্চিন্তভাবে কাল কাটাইতে লাগিল।

মোক্তারপূরের কতকগুলি অকালকুষ্মাণ্ড ছোকরা অনেক দিন হইতেই গ্রামে একটী সখের থিয়েটার সম্প্রদায় করিয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত অধ্যক্ষের অভাবে তাহার পরিচালনা কার্য্য এতদিন তেমন সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছিল না। রাধানাথ নাট্যাচার্য্য হইয়া তিন মাসের মধ্যেই পিতার ত্যক্ত নগদ টাকা যাহা পাইয়াছিল তাহা নিঃশেষ করিয়া দিল।

রামধন, প্রাণধন প্রভৃতি ক্লাবের জনকয়েক সভ্য এই সময়ে পূজার ছুটিতে কলিকাতা ঘুরিয়া আসিয়া রাধানাথকে জানাইল

যে—এবার অমুক থিয়েটার যে অমুক বইখানি খুলিয়াছে, সেখানি কি 'গ্র্যাণ্ড'! যেমন তাহাতে দৃশ্যপটের কৌশল দেখান যাইতে পারে, তেমনি আবার অভিনয় করাও এত সহজ ও লোক এত কম যে ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই বইখানি প্লে না করিলে তো আর মোক্তারপুর ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ইউনিয়নের নামও বজায় থাকে না, মর্য্যাদাও না!

পাঁচজনে পাঁচরকম করিয়া কথাটা রাধানাথের মনের ভিতর বদ্ধমূল করাইয়া দিল। রামধন মাতাইল যে পাঁচশত টাকা হাতে পাইলে সে মোক্তারপুর ক্লাবকে এমন অবস্থায় পরিণত করিয়া দিতে পারে যে কলিকাতার শ্রেষ্ঠ থিয়েটারের ম্যানেজার আসিয়া দেখিলেও বাহবা না দিয়া থাকিবার যোটী নাই!

খুব ঘষামাজা করিয়া হিসাব ধরিলেও দেখা গেল যে—আপাততঃ পাঁচশত টাকা খরচ করিলে টিকিট বেচিয়া তাহার দ্বিগুণ টাকা উঠিয়া আসিতে এক সপ্তাহের বেশী লাগিবে না, অথচ ক্লাবের দৈন্যদশা অচিরাৎ ঘুচিয়া গিয়া লক্ষ্মীশ্রী মণ্ডিত হইবে।

যাহারা ক্লাবের দৈন্যদশা ঘুচাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, টাকা পাওয়ার রাস্তাটাও তাহারাই দেখাইয়া দিল। একজন বলিল "বাড়ী তো অনেক দিনই পার্টিসন হইয়া গেছে, সুতরাং

তোমার অংশটা যদি ত্রৈলক্য মিত্তিরের কাছে ওর নাম কি—"

ত্রৈলক্য মিত্তিরকে ক্লাবগৃহেই উদ্যোগ করিয়া আনা হইল, এবং একখানি দলিলে স্বাক্ষর করিয়া এবং তাহা রেজেষ্টারি করিয়া দিয়া এক সপ্তাহের মধ্যেই নগদ পাঁচশত টাকা হাতে পাইয়া রাধানাথ এবং তাহার সহচরবর্গের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

কলিকাতা হইতে সিন আসিল, নূতন পোষাক আসিল, পাঁচশত টাকার শেষ কপর্দ্দকটীও ব্যয় করিতে কেহই কার্পণ্য করিল না। এই ভাবে প্রায় তিনটী বৎসর কাটিয়া গেল, তার পর হঠাৎ সেদিন সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া মূর্ত্তিমান রস-ভঙ্গের মত রিহার্সালের মাঝখানে জমাট নাটকটীর গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়া অকস্মাৎ বিনোদ চৌধুরীর প্রবেশ!

জীবনের মধ্যে এমন অনেক সময় আসে যখন হৃদয়ের আব-রণ উঠিয়া গিয়া তাহার অভ্যন্তর ভাগটা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, যেটা এতদিন গোপন ছিল, যাহার অনুভূতি এতদিন পাওয়া যায় নাই, সেইটাই সব চেয়ে বেশী করিয়া প্রকাশিত হইয়া উঠে।

বিনোদ চৌধুরীর প্রস্থানের পর সেই রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া জীবনের মধ্যে প্রথম সেই দিন রাধানাথ ভাবিয়া দেখিল

যে সে কতদূর নামিয়াছে, এবং ভাল হইবার যে সহজ পথটীকে সে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, পুনরায় সেটাকে আবিষ্কার করিতে হইলে তাহাকে আবার কতখানি বেগ পাইতে হইবে।

তাহার শৈশবের দিনগুলির একখানি মানচিত্র তাহার মনের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল। জীবনে সে কখনও কাহারও আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা পায় নাই। তাহার শৈশবেই তাহার মাতা তাহাকে এই জগতের মাঝখানে ত্যাগ করিয়া এক অজানিত লোকে চলিয়া গিয়াছেন। স্নেহের অতৃপ্ত ক্ষুধাটা লইয়া সে যেখানেই গিয়াছে, সেখানেই প্রতারিত হইয়াছে—বন্ধু বলিয়া যাহাদের মনে করিয়াছিল, তাহারা তাহাকে সর্ব্বনাশের রাস্তা দেখাইয়া দিয়া নিজেরা অদৃশ্য হইয়াছে, আত্মীয়েরা তাহার দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া তাহাকে পথে বসাইবার উদ্যোগ করিয়াছে। জগতে আজ তাহার নির্ভর করিবার মত এতটুকু আশ্রয় নাই। বিশ্বের মাঝখানে আপনার বলিয়া আত্মনির্ভর করিতে পারে এমন লোকও আজ দুর্ল্লভ!

একটু ভাল করিয়া সে ভাবিয়া দেখিল যে যদি জেঠ্যামহাশয় নীলামে তাহার বাড়ীখানি না ডাকিয়া লন, আর সত্য সত্যই যদি একজন তৃতীয় ব্যক্তি তাহা অধিকার করিতে আসে, তাহা হইলে—ছিঃ ছিঃ সে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া! জেঠামহাশয়

যে তখন তাহার প্রতি ঠিক কিরূপ ব্যবহার করিবেন এবং তাহার ভীষণতা যে কত গুরুতর তাহা সে অনুমান করিয়া লইল এবং মোক্তারপুরের আবালবৃদ্ধ বনিতা যে তাহার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া টিটকারী দিবে, নাট্যকলার উন্নতির জন্য সে যে নিজের আশ্রয়টুকুও পরিত্যাগ করিয়াছে ইহা ভাবিয়া তাহাকে বাহবা দিবার লোক এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির মধ্যে একটীও পাওয়া যাইবে না, তাহা সে এতদিন পরে যেন দিব্যচক্ষেই দেখিতে পাইল। এই ক্ষুদ্র জলটুকুর গভীরতা এতই কম যে তাহাতে আত্মগোপন করিবার কোন উপায়ই সে খুঁজিয়া পাইল না।

এই পরিণামটীকে যে স্বেচ্ছায় ডাকিয়া আনিয়াছে, এবং ইহা তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ রোগের চিকিৎসা সে কথাটা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সেই নিশীথ রাত্রে নিজের কৃতকার্য্যের জন্য রাধানাথ মনের মধ্যে বড়ই একটী ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতে লাগিল।

অনেক চিন্তার পর তাহার মাথায় এক মতলব বাহির হইল। সে শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে একবার বাহিরে আসিয়া চারিদিকে চাহিল। পূর্ণিমার নিস্তব্ধ রাত্রি সমস্ত গ্রামখানিকে জ্যোৎস্নায় মুড়িয়া দিয়াছে, মেঘলেশহীন আকাশের বুকে নক্ষত্রের পুঞ্জ যেন হীরার দোকান খুলিয়া দিয়াছে।

অত্যন্ত চঞ্চলভাবে সে পায়চারি করিতে লাগিল। আগ্নেয়

গিরির অগ্নি উচ্ছ্বাসের মত একটা অতি প্রবল শক্তি তাহার তপ্ত মস্তিষ্কের ভিতর অতীত ও ভবিষ্যৎ সব যেন একাকার করিয়া দিল।

যে সঙ্কল্পটা মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে একটী ক্ষীণ রেখা রূপে তাহার মস্তিষ্কে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, সেটার ভিত্তি পরমুহূর্ত্তেই যেন হঠাৎ দৃঢ়তর হইয়া গেল এবং সেই সঙ্কল্পটীকে কার্য্যে পরিণত করিবার একটা অদম্য ইচ্ছা এঞ্জিনের ষ্টীমের মত তাহাকে ভিতর হইতে ক্রমাগত ধাক্কা দিতে লাগিল।

রাধানাথ তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর গিয়া কাগজ কলম লইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতকে একখানি পত্র লিখিতে বসিল। মনের উত্তেজনায় কি লিখিল তাহার ঠিক নাই, ২।১ বার পড়িয়া সেখানিকে তাহার শয্যার উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল এবং মুহূর্ত্তকাল তাহার আবাল্য পরিচিত সেই গৃহটীর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের থিয়েটারের ক্লাবঘরের দিকে অগ্রসর হইল। সেখানে পোষাকের বাক্সটা সেই ভাঙ্গা আলমারির পার্শ্বেই পড়িয়াছিল, রাধানাথ তাহার চাবি খুলিল। নূতন নাটকখানিতে দেবর্ষি সাজিবার জন্য যে নূতন পোষাকটী কলিকাতা হইতে আনা হইয়াছিল, সেইটাই বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া সে পরিধান করিল, মাথায় গেরুয়া কাপড়ের একটী পাগড়ী জড়াইল, তার পর পোষাকের বাক্স এবং ক্লাবঘরের চাবি বন্ধ

করিয়া, চাবির গোছাটাকে সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, ধীরে ধীরে ষ্টেশনের রাস্তা ধরিল।

৪

সেদিন সন্ধ্যার সময় ব্যোমনাথের শীতল লইয়া সিদ্ধেশ্বর মিত্রের কন্যা বনমালা বাড়ীতে আসিয়া তাহার মাতাকে বলিল "মা, আজ কি মজা হয়েছে জান ?"

মাতা সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি লা ?"

বনমালা একগাল হাসিয়া বলিল, "আজ ঠাকুরের শীতল আনতে গিয়ে দেখি যে স্বামীজি ভোগ রাঁধছেন। পাপমুখে আর বলবো কি মা, সে দেখে আমার এমনি হাসি এলো, যে তা আর বলবার নয়।"

মাতা জিজ্ঞাসাকুল দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। বনমালা বলিতে লাগিল, বাঁটুলো থেকে ভাত ঢেলে একখানা পাতায় রেখেছেন, বল্লে তুমি বিশ্বাস করবে না, সমস্ত ভাতগুলি পুড়ে গিয়েছে। আমি বল্লাম, স্বামীজি, এ কি কাণ্ড! এই ভাত ঠাকুরকেই বা দেবেন কি করে, নিজেই বা খাবেন কি করে ?"

"তার পর ?"

"আহা! স্বামীজির মুখখানি দেখে বড় কষ্ট হল। তিনি শুকনো মুখে বললেন, কি আর করবো বল, ভোগ চড়িয়ে পূজো করতে গিয়েছিলাম, ভাত সব পুড়ে গিয়েছে। ওই ভাতই এক-

রকম করে বেছে নিয়ে ঠাকুরকে ভোগ দিতে হবে।' আমি বল্লাম, 'বল কি ঠাকুর! এই ভোগ কখনও মানুষে দেয়।' স্বামীজি তখন বল্লেন, 'তবে খান কতক রুটী তৈরী করি!' মা, তোমাকে বলবো কি, সে রুটী তৈরী করবার ছিরি যদি একবার দেখতে!—বলিয়া বনমালা মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া একেবারে লুটোপুটী হইল।

তাহার মাতা রুষ্টা হইয়া বলিলেন, "রকম দেখ না মেয়ের, ঠাকুরের ভোগের কথা নিয়ে কখনও হাসতে আছে? এমনিই তো বরাত পুড়েছে।"

কন্যা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আমি বল্লাম, "স্বামীজি, যদি আমি ছুঁলে কোন দোষ না হয়, তা হলে আমিই না হয়, ময়দা কখানা গড়ে দিই।"

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্লেন ঠাকুর?"

"ঠাকুর বল্লেন, 'তাতে কখনও দোষ হয়?" আমি ওসব মানিনে! তোমরা তো জান, আমি প্রথম দিন তোমাদের বাড়ী তোমাদেরই রান্না খেয়েছিলাম।' ঠাকুর ময়দা গুলো আমাকে দিলেন! আমি ময়দা বেলে দিয়ে, রুটী সেঁকে তবে আসছি।"

মাতা সহাস্যে বলিলেন—তা বেশ করেছিস্। আহা বাঙ্গালী সাধু কি না, দেখেই বোধ হয় ছেলেমানুষ, রান্না বান্না করা বোধ হয় কখনও অভ্যাস নেই।"

বনমালা, বলিল, "বোধ হয়। আমি চলে আসছি এমন সময় ঠাকুর আমাকে ডেকে বললেন যে তুমি না হয় একটা দিন এসে ভোগ রেঁধে দিয়ে গেলে, অন্য দিনের উপায় কি হবে? আমার তো প্রায় রোজই ভাত হয় পুড়ে যায়, না হয় ধরে যায়, না হয় কাঁচা থাকে।' সেখানে লছমনিয়া, বন্দী সিং, বুড়ো পিয়ারী-সব বসে ছিল, তারা তো শুনে হেসেই অস্থির। আমি বলে এলাম যে 'আচ্ছা ঠাকুরমশাই, আমি রোজ বিকেলে এসে বরং তোমার ঠাকুরের ভোগ বেঁধে দিয়ে যাব। সকালে বাবা ইষ্টিশানে চলে যান,সেজন্যে তাড়াতাড়ির মধ্যে সকালে আসা আর ঘটে উঠ্‌বে না, বিকেলেই আমি আসবো। তাতে কোন দোষ হবে না তো!" ঠাকুর বল্লেন, "ঠাকুরের ভোগে কখনও দোষ হয়? সেই ভাল, তুমিই এসে রেঁধে দিও।"

মাতা শুনিয়া বলিলেন, "তা বেশ করেছিস। আহা! দুঃখুই হয় বটে। হাজার হোক, সাধুপুরুষ তো বটে!

এমনি করিয়া আরও কিছুদিন গেল। বনমালা স্বামীজির কুটীরে আসিয়া প্রত্যহ অপরাহ্ণে ব্যোমনাথের ভোগ রাঁধিয়া দিত, ঠাকুরের আরতির আয়োজন করিয়া দিত, তারপর শীতল লইয়া চলিয়া যাইত। স্বামীজি অত্যন্ত তৃপ্তিপূর্ব্বক সেই ভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া নিজেও আহার করিতেন। তাঁহার ভক্তেরা ইহাতে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া থাকিত, ব্রাহ্মণেতর

জাতীয় এক বিধবার হস্তস্পৃষ্ট ও তাহারই রন্ধন করা ভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করিতে বা নিজেও আহার করিতে স্বামীজি যে সঙ্কোচের পরিবর্ত্তে আরও পরিতৃপ্তি বোধ করিতেন, ইহাতে ব্যোমনাথের ভক্তের দল চঞ্চল হইয়া উঠিল। দুই একজন এ সম্বন্ধে তাঁহাকে একটু প্রশ্নও করিল কিন্তু স্বামীজি বেশ করিয়া তাহাদের বুঝাইয়া দিলেন যে মানুষের কাছে জাতিভেদ চলিতে পারে, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান ব্যোমনাথের কাছে ওসব চালাকি চলিবে না। ভগবান জাতির সৃষ্টি করেন নাই, তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তা, সুতরাং সেখানে ব্রাহ্মণও নাই, চণ্ডালও নাই, সধবাও নাই, বিধবাও নাই, 'নয়ন মুদিলে সব শব রে!'

ডগমগপুরের ভক্তেরা এ কথায় কেহবা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া মাথায় দিতে লাগিল, কেহবা তাঁহার উপর শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া তাঁহার দুর্ণাম রটাইতে লাগিল, কেহবা আশ্রমে যাতায়াত ত্যাগ করিল।

৫

আরও কিছুদিন গত হইবার পর হঠাৎ একদিন অপরাহ্নে বনমালার নিয়মিত আগমন বন্ধ হইল। স্বামীজি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষা করিয়া অবশেষে তাহার আগমনের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। সেদিন আর ব্যোমনাথের ভোগ রন্ধন হইল না। একজন ভক্ত দ্বিপ্রহরে

তাহার গৃহে প্রস্তুত কয়েকটী ক্ষীরের লাড্ডু দিয়া গিয়াছিল, স্বামীজি সে রাত্রে তদ্বারা নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন।

পরদিন গেল, সেদিনও বনমালা আসিল না। স্বামীজি বড়ই চিন্তিত হইলেন, একবার ভাবিলেন যে সিদ্ধেশ্বরবাবুর বাড়ীতে যাইয়া একবার খবরটা লইয়া আসা যাক, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে যেন কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। সে রাত্রে দ্বিপ্রহরের রান্না অর্দ্ধদগ্ধ অন্নাহার করিয়াই তাঁহার কাটিল।

পরদিন লছমনিয়ার মা আসিয়া স্বামীজিকে নিবেদন করিল যে যদি অনুমতি হয় তাহা হইলে সেই ঠাকুরের ভোগ রাঁধিয়া দিতে পারে। স্বামীজি তাহাকে রুক্ষভাবে জানাইলেন যে তাহার ন্যায় হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের দ্বারা যদি বাঙ্গালী ঠাকুরের ভোগ রন্ধন সম্ভব হইতে পারিত, তাহা হইলে আর ভাবনা থাকিত না।

লছমনিয়ার মা মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে স্বামীজি তাহাকে বলিলেন,—"দেখ লছমনিয়ার মা, রাগ করিস্ নে। আমরা বাঙ্গালী সাধু, আমাদের বাংলা দেশের ভোগ না হ'লে ঠাকুরের তৃপ্তি হয় না। তুই একটী কাজ করতে পারিস্।"

লছমনিয়ার মা জিজ্ঞাসা করিল,—"কি কাজ?"

কথাটা বলিতে গিয়া স্বামীজির গলাটা যেন হঠাৎ বাধিয়া গেল। একটু কাসিয়া, গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে বৃদ্ধাকে বলিলেন,—"একবার গিয়ে খবরটা আন্‌তে পারিস্।"

কথাটা বুঝিতে না পারিয়া লছমনিয়ার মা বলিল,—"কিসের খবর ঠাকুর বাবা!"

এই সামান্য কথাতেই যে স্বামীজি বিরক্ত হইয়া উঠিবেন, তাহা লছমনিয়ার মা কল্পনাতেও জানিতে পারে নাই! ভ্রূকুটী করিয়া স্বামীজি বলিলেন,—"তোদের যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে! দেখ্‌ছিস্ আজ দুই তিনদিন রান্না বন্ধ, ঠাকুরের ভোগ বন্ধ, আর তুই কিনা জিজ্ঞাসা করছিস্ কিসের খবর! যা যা, তোর আর খবর আন্‌তে হবে না।"

লছমনিয়ার মা হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে তখন আসল কথাটা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল, কিন্তু আর সাহস করিয়া ঠাকুরবাবাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

সিদ্ধেশ্বরবাবুর বাড়ী হইতে সে আধঘণ্টার মধ্যেই ঘুরিয়া আসিল এবং স্বামীজিকে জানাইল যে সে সেই মাঈজি এখানে নাই।

এখানে নাই! স্বামীজি হঠাৎ যেন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া

উঠিলেন। বলিলেন,—"তুই কি সত্যি সত্যিই গিয়েছিলি রে লছমনিয়ার মা ?"

বৃদ্ধা করযোড়ে বলিল,—"হাঁ ঠাকুরবাবা, না যাইয়াই যদি মিথ্যে কথা বলিয়া থাকি তাহা হইলে ব্যোমনাথ যেন তাহার জিভ——"

"যাক্ যাক্ লছমনিয়ার মা, আর দিব্যি গালিস্ নে। গেলি তো আমাকে বলে গেলিনে কেন! তারপর কি বল্লে তারা? নেই সে এখানে? কোথায় গেল কিছু শুনে এলি, না অমনিই ফিরে এসেছিস্ বুঝি? তোদের বুদ্ধি তো!"

এতগুলি প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া লছমনিয়ার মা জানাইল যে সে বাবুজীর বাড়ী যাইয়া মায়ীজির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল, তাহাতে বাবুজী বলিলেন যে, সে এখানে নাই। এই কথা শুনিয়াই সে চলিয়া আসিয়াছে, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নাই।

লছমনিয়ার মাকে বিদায় দিয়া স্বামীজির বড়ই চিন্তা হইল। কোথায় সে গেল এবং হঠাৎ কোন স্থানে যাইবার এমন কি অপরিহার্য্য প্রয়োজন তাহার উপস্থিত হইল, এই কথাটা বারবার তাঁহার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। আর একবার ভাবিলেন যে নিজেই যাইয়া সংবাদটা একবার লইয়া আসি, কিন্তু পুনরায় একটা সঙ্কোচের বাধা আসিয়া

তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিল। সমস্ত দিনটা এইরূপ চঞ্চলতার ভিতর দিয়া কখন কি ভাবে কাটিয়া গেল, তাহা স্বামীজি বুঝিতে পারিলেন না। দ্বিপ্রহরে দুই একজন ভক্ত আসিয়া আজগুবি গল্পে আসর জমাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু স্বামীজি এমনি কঠোর ভাবে তাহাদের বিদায় দিলেন, যে তাহারা যথেষ্ট বিস্ময়ের সহিত তৎক্ষণাৎ আশ্রম ত্যাগ করিল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় স্বয়ং সিদ্ধেশ্বর বাবু তাঁবার বাটিটী হাতে করিয়া ঠাকুরের শীতল লইতে আসিলেন। সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তখনও আশ্রমগৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে নাই। ভক্তবৃন্দও এই দুই দিনে স্বামীজির অভূতপূর্ব্ব আচরণ দেখিয়া সেদিন সন্ধ্যার সময় আর আসে নাই।

সিদ্ধেশ্বর বাবু আসিয়া দেখিলেন, নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর স্বামীজি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। হয় তো বা জপে নিযুক্ত আছেন মনে করিয়া সিদ্ধেশ্বর বাবু কয়েকমূহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং এ সময়ে কথা কহিয়া সন্ন্যাসীর যোগ-ধর্ম্মে ব্যঘাত উচিত কিনা ভাবিতে লাগিলেন। প্রায় এক-মিনিটকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন,—"আজ যে সন্ধ্যে টন্ধ্যে কিছুই জ্বলেনি দেখছি।"

স্বামীজি চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সিদ্ধেশ্বর বাবুকে দেখিয়াই হঠাৎ যেন তাহার বক্ষ স্পন্দিত হইয়া উঠিল, গলাটা

যেন অস্বাভাবিক রকম শুষ্ক হইয়া উঠিল। তিনি একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"এই যে আসুন। না, আজ আর প্রদীপ জেলে রাখিনি, এমন পূর্ণিমার চাঁদের আলো থেকে ঠাকুরকে বঞ্চিত করে রাখাটা কি ঠিক? প্রদীপ জেলে তো কোন দিন চাঁদের অভাব পূর্ণ করা যাবে না, কিন্তু চাঁদের আলোর মধুরতা যে হাজার প্রদীপের চেয়েও ঢের বেশী। আসুন বসবেন।" বলিয়া উপরে উঠিয়া সিদ্ধেশ্বর বাবুকে বসাইলেন, নিজেও বসিলেন। কয়েকমুহূর্ত্ত নিস্তব্ধতার পর স্বামীজি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই দুই তিনদিন তো কই ঠাকুরের শীতল নিয়ে কেউ আসেনি।"

সিদ্ধেশ্বর বাবু বলিলেন,—"আর মশাই, অসুবিধের কথা আর বলেন কেন? আমার চাকরী তো জানেন, দিনরাত্তির কেবল ষ্টেশন আর রেলের ঘড়ঘড়ানি, এই নিয়েই দিন গুজরান করা। তার উপর আবার আমার বৈবাহিক মশাই এসেছিলেন পরশুদিন সন্ধ্যার ট্রেণে। কি সমাচার? না বউমাকে নিয়ে যাব। যাই বলি মশাই, অদৃষ্টের উপর তো হাত নেই, মেয়েটা বিধবাই হোক আর যাই হোক, শ্বশুরবাড়ী যাবে, শ্বশুর স্বয়ং নিতে এসেছেন, তাতে তো আর আপত্তি করতে পারি নে। কাজেই পাঠিয়ে দিতে হোল। সেই জন্তেই, বুঝলেন স্বামীজি,

এই দুটো দিন মনটা বড়ই খারাপ হ'য়ে ছিল, তাই আর আসতে পারিনি। হাজার হোক মেয়ে তো!"

সিদ্ধেশ্বর বাবুর কথার উত্তরে স্বামীজি কেবলমাত্র বলিলেন, —"হ্যাঁ, তা হবে বৈকি"

আবার কয়েকমুহূর্ত্ত নিস্তব্ধতার পর সিদ্ধেশ্বর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই পশ্চিমেই বুঝি আপনার মেয়ের শ্বশুরবাড়ী?"

সিদ্ধেশ্বর বাবু বলিলেন,—"না, না, তাহ'লে আর ভাবনা ছিল কি? সে এক দুর্গম স্থানে মশাই। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নাম শুনেছেন তো? সেই সেখান থেকে পনের মাইল রাস্তা গরুর গাড়ীতে গিয়ে বাবুগঞ্জ গ্রাম। বর্ষাকালে তো অগম্য বল্লেই হয়। আর তার উপর ম্যালেরিয়ার কথা তো বলেই কাজ নেই। আমি সেই একটীবার গিয়েছিলুম, ছেলে আশীর্ব্বাদের সময়—" বলিতে বলিতে সিদ্ধেশ্বর বাবু হঠাৎ থামিয়া গেলেন, পাত্র আশীর্ব্বাদের সেই দিনটীর সহিত কন্যার বর্ত্তমান অবস্থার কথা মনে করিয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

স্বামীজি বলিলেন,—"বাবুগঞ্জে? বর্দ্ধমান জেলায়? কাটোয়ার কাছে? কাদের বাড়ী বলুন তো?"

সিদ্ধেশ্বর বাবু বলিলেন,—"কেন, জানেন নাকি ওদিককার

কাউকে? বাবুগঞ্জের পীতাম্বর বসু, তিনিই আমার বেয়াই হন। চেনেন নাকি তাঁকে? এই পরশুদিন এসেছিলেন, আহা হা,—নিয়ে এলেই তো হোতো তাহ'লে আপনার কাছে।"

বাধা দিয়া স্বামীজি বলিলেন,—"না না, চিনিনা আমি কাকেও। এমনিই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলাম। একবার আমার একটী শিষ্যের সঙ্গে ওদিকে গিয়েছিলাম কিনা!"

স্বামীজি আর কোন প্রসঙ্গ না তুলিয়া ব্যোমনাথের মাথায় একটু গঙ্গাজল ঢালিয়া দিলেন এবং তাহাতে গোটা দুই অর্দ্ধশুষ্ক ফুল ফেলিয়া দিয়া, সিদ্ধেশ্বরবাবুর সেই তাঁবার বাটিটীতে ঠাকুরের শীতল দিলেন, তিনি চলিয়া গেলেন।

সিদ্ধেশ্বর বাবুকে যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ স্বামীজি তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চহিয়া রহিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনের তারে একটা যেন কিসের রাগিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। কি এ! আত্ম-বিস্মৃতি না মনের বিকার!—স্বামীজি তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। তাঁহার সমস্ত দেহ-মনের ভিতর দিয়া যেন একটা বৈদ্যুতিক কম্পনের সাড়া দিয়া উঠিল, দুই চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, ঘন নিঃশ্বাসে তাহার রক্তস্রোত হঠাৎ যেন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে সম্মুখস্থ গাছতলায় পদচারণা করিতে লাগিলেন।

আরও দুই তিনদিন গেল। এই দুই তিনদিনের মধ্যেই যে স্বামীজির একটা মস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা বন্দী সিংহ, পেয়ারী, লছমনিয়া প্রভৃতি স্পষ্টই লক্ষ্য করিল। স্বামীজি তাহাদের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় আর হাস্য পরিহাসে যোগ দেন না, কথাবার্ত্তাতেও একটা চঞ্চলতার ভাব যেন দিন দিনই বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে এবং তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন এই সব ভক্তবৃন্দের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট হন।

নদীর ধারে অনেকগুলি মহুয়াগাছের সারি ছিল, তাহারই একটার তলায় একটা শুষ্ক গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া সেদিন স্বামীজি অলসভাবে কখনও বা আকাশের দিকে, কখনও বা সম্মুখস্থ নদীটার দিকে চাহিয়া ছিলেন। অনেকদিন পরে আবার তাঁহার জীবনের পূর্ব্বদিনগুলির স্মৃতির কপাট যেন খুলিয়া গেল। বাল্য ও কৈশোরের সেই যে স্নেহপ্রেমের একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা ও তাহারই অভাবে যে তীব্র অভিমানের মাত্রাটা তাঁহার সমস্ত হৃদয়-মনকে জুড়িয়া রাখিয়াছিল, যাহার তাড়নায়, একদিন মোক্তারপুরের নিকট হইতে গোপনে বিদায় লইয়া এই উদ্দেশ্য-হীন জীবনটাকে বিশ্বের স্রোতের মাঝখানে ভাসাইয়া দিয়া-ছিলেন, সেগুলি আবার স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। তখন জীবনের মধ্যে কোথাও কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয়

নাই, কিন্তু আজ যেন মনে হইল, ওই মহুয়াশ্রেণীর অন্তরাল হইতে, রৌদ্রকরোদীপ্ত ঐ নদীর পরপার হইতে, বৈধব্যের শুভ্র আবরণে মণ্ডিতা এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি যেন তাহার মানসিক ও তরঙ্গায়িত কৃষ্ণকেশ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহারই দিকে অনিমেষে চাহিয়া তাঁহার হৃদয়ের সুপ্ত প্রেমকে কোন এক সোণার কাঠীর মোহন স্পর্শে চেতন করাইয়া দিয়া জানাইতেছে যে জীবন তোমার ব্যর্থ নয়, উহার অসম্পূর্ণতার আবরণে সত্তা আছে, জীবনের হোমাগ্নি ভস্মের মধ্যে এখনও জ্বলিতেছে, ভস্মের আবরণটুকু উড়িয়া গেলেই অগ্নিশিখা আবার জ্বলিয়া উঠিবে। প্রেমের যে মন্দাকিনী প্রবাহ ফল্গুধারার মত তাঁহার জীবনের সম্মুখ দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে এতদিন বহিয়া গিয়াছে, আজ তাহারই কল গান যেন সহসা তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া দিল, তাঁহার স্বেচ্ছা-পরিত্যক্ত গার্হস্থ্যজীবনের মধ্যে যেন সহসা এক সোণার পুরী সৃজিত হইয়া গেল!

পরদিন প্রাতে জগমগপুরের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখিল যে স্বামীজির কুটীর শূন্য! সামান্য যে দুই একটা তৈজস পত্র গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে দিয়াছিল, তাহা কুটীরের মধ্যেই পড়িয়া আছে, আর সেই শূন্য মন্দিরের প্রহরীরূপে ঠাকুর ব্যোমনাথ সম্মুখস্থ মহুয়া বৃক্ষের তলায় তখনও তেমনিভাবে বিরাজ করিতেছেন।

৬

বাবুগঞ্জ গ্রামখানি একসময়ে সমৃদ্ধ ছিল বলিয়াই জনপ্রবাদ, এখন কালের কল্যাণে তাহার পূর্ব্বগৌরব সবই গিয়াছে, সামান্য একখানি গণ্ডগ্রাম ছাড়া ইহাকে এখন আর কিছুই বলা যায় না।

এই ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে একটী ডাক্তারের অভাব অনেক দিন হইতেই গ্রামবাসীরা অনুভব করিতেছিল, সাত আট ক্রোশের মধ্যে একটি গ্রামে একজন মাত্র শতমারী "গৃহ-চিকিৎসা" পড়িয়া চিকিৎসা করিতেন, তাঁহার হাতে যতগুলি রোগী চিকিৎসার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, ডাক্তারবাবু তাহাদের চিরদিনের মতই নিশ্চিন্ত করিয়া দিয়াছেন। মৃত্যুদেবতার এই এজেণ্টটী যখন এক এবং অদ্বিতীয়রূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ একদিন বাবুগঞ্জের বাবুদের বহুকালের পরিত্যক্ত চণ্ডীমণ্ডপটার জীর্ণ খুঁটীর গায়ে লম্বমান একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠফলকে আলকাতরার অক্ষরে লেখা এক সাইনবোর্ড দেখিয়া সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। যাহারা ইংরাজী জানিত তাহারা পড়িয়া দেখিল যে তাহাতে লেখা রহিয়াছে "ডাক্তার রাধানাথ চৌধুরী, হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশ্যানার।"

বাবুগঞ্জ ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্র হইয়া গেল যে ডাক্তারবাবু কেবল যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিবেন তাহা নহে, প্রয়োজন

হইলে তিনি স্বয়ং রোগীর বাড়ী যাইয়া বিনা ভিজিটে দেখিয়া আসিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার আহার ও বাসের বন্দোবস্তের ভার গ্রামের জমীদার বাবুরাই নাকি বহন করিবেন।

গ্রামের লোকেরা কেহ বা জমীদারকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, কেহ বা ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। প্রাতে এবং অপরাহ্নে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ইতর ও ভদ্র বহুলোকের সমাগমে চণ্ডীমণ্ডপের পরিত্যক্ত প্রাঙ্গন অনেকদিন পরে আবার কোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিল।

বাবুগঞ্জের মধ্যে এত লোক থাকিতে ডাক্তারবাবু কি কারণে নানা অছিলায় পীতাম্বর বসুর সহিত অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খুব বেশী করিয়া ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিলেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা এখানে নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু দেখা যাইতে লাগিল যে ডাক্তারবাবু নিজে তাম্রকুটসেবী না হইয়াও বৃদ্ধ পীতাম্বরের জন্য প্রত্যহ অম্বুরি তামাকের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতেন, নিজে শতরঞ্চ খেলায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াও এই ক্রীড়া বিজ্ঞানটীর সমস্ত সরঞ্জাম আনাইয়া পীতাম্বরের সহিত খেলিতে বসিয়া প্রতি পদে পরাজয় স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, এবং পীতাম্বরের বাড়ীতে কাহারও শারীরিক অসুস্থতার এতটুকু খবর পাইলেই কেবল যে ঔষধ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন তাহা নহে, তাঁহার বাড়ী যাইয়া রোগী দেখিয়া আসিবার জন্য এমন অস্বাভাবিক

রকমের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন যে অন্যলোকে তাহাকে বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে করিত! কেবল তাহাই নহে, ২।১ দিন এমন ঘটনাও ঘটিতে লাগিল যে উপস্থিত রোগীগণের শারীরিক অবস্থা সংক্রান্ত বিবরণের প্রতি তাদৃশ মনঃসংযোগ না করিয়া পীতাম্বরের বাড়ীর উঠানে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েকটী শসা গাছ এবং কুমড়া গাছ কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছে তাহারই কাহিনী এই ডাক্তারবাবুটী অতি নিবিষ্টমনে শুনিতে লাগিলেন।

পীতাম্বরের বাটীর পার্শ্বে ক্ষুদ্র একখণ্ড জমী বহুকাল হইতে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকায় জঙ্গল ও আগাছায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেই ভূমিখণ্ডটুকুর উপর ডাক্তারবাবুর হঠাৎ নজর পড়িল। কয়েকদিন পরেই তিনি কথাটাকে নানা ভূমিকাসহ পাড়িয়া পীতাম্বরকে জানাইলেন যে ওই জমীটুকু পাইলে সেখানে তিনি একটু ক্ষুদ্র বাগান করিবেন মনে করিয়াছেন। বাজারে আজকাল বেগুন এবং কাঁচকলা যে কিরূপ মহার্ঘ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং এই উভয় উদ্ভিদের পক্ষেই ঐ স্থানটুকুর উর্ব্বরাশক্তি যে কতখানি বেশী তাহারও একটা দীর্ঘ বিবরণ তিনি পীতাম্বরকে বলিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু বৃদ্ধ পীতাম্বর অত্যন্ত স্থিরভাবে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে যদি তরিতরকারীর বাগান করিবার ইচ্ছাই ডাক্তার বাবুর

হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি অতি উত্তম স্থান নির্ব্বাচন করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু যে জমিটীর কথা তিনি প্রস্তাব করিতেছেন সেখানে বাগান করিলে পয়সাও নষ্ট হইবে, ফসলও হইবে না! ওখানে পূর্ব্বে কোঠাবাড়া ছিল, তাহারই অসংখ্য ইট ভূগর্ভে প্রোথিত আছে, সুতরাং আগাছার বন দেখিয়া উক্ত জমিটীর উর্ব্বরতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া ঠিক বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

ডাক্তারখানার পার্শ্বেই আরও অনেকখানি জমি পড়িয়াছিল, তাহারই একখণ্ডে গত বৎসর জনৈক কৃষাণ বেগুনের চাষ করিয়া কিরূপ লাভবান হইয়াছিল, সে কথার উল্লেখ করিয়া পীতাম্বর বলিলেন যে, ঐ জমিটুকু যদি ডাক্তারবাবু জমীদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে———

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যে বেগুনের ক্ষেত্র করিবার উৎসাহ ডাক্তারবাবুর এক মুহূর্ত্তেই নিভিয়া গেল এবং পরক্ষণেই ভদ্র-সন্তানের এ সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পরিণাম সম্বন্ধে কতক-গুলি কাল্পনিক উদাহরণ বলিয়া ফেলিলেন।

এইভাবে ডাক্তারবাবু প্রায় মাসখানেক কাল বাবুগঞ্জে কাটাইলেন। এমন সময়ে একটী ঘটনা ঘটিল।

প্রতি বৎসর পূজার সময়ে বাবুগঞ্জে একটী মেলা বসিত, তাহাতে লোক সমাগমে পুষ্করিণীর জল দূষিত হইয়াই হউক

বা যে কোন কারণেই হউক, পূজার পরেই গ্রামের মধ্যে একবার করিয়া ওলাউঠার প্রকোপ হইত। এবার দৈব-বিড়ম্বনায় এই ব্যাধি একেবারে মহামারীরূপে গ্রামে প্রবেশ করিল।

মহামারীর প্রকোপে প্রথম পড়িল চাঁড়ালদের একটী ছেলে, তার বাপ রাধানাথের পা জড়াইয়া ধরিয়া পড়িল। রাধানাথ অনেক চিন্তার পর ঔষধ দিল, কিন্তু ছেলেটী বাঁচিল না।

এইবারে তাহার মনে হইল যে জীবন লইয়া এমন ছেলেখেলা করিলে আর চলিবে না। নিজের উদ্দেশ্য লইয়া সে যাহা খুসী করিতে পারে, কিন্তু পরের জীবনের দায়িত্ব লইয়া এ কি বিড়ম্বনা!

সেই দিনই সে জমিদার বাবুদের বাড়ী যাইয়া তাঁহাদের জানাইল যে এই মহামারীর সময়, যেখানে অনেক লোকের জীবন লইয়া টানাটানি, সেখানে একজন ভাল পাশকরা ডাক্তার আনিলেই ভাল হয়। আমি বরং তাঁহাকে সাহায্য করিব, নয়তো এ দুঃসময়ে আমি একা সব পারিয়া উঠিব বলিয়া বোধ হয় না।

বাবুরা কথাটাকে অপ্রকৃত ভাবিলেন না। বাবুদের একজন আত্মীয় কলিকাতায় থাকিতেন, তিনি সংবাদ পাইয়া একজন পাস করা ডাক্তার পাঠাইয়া দিলেন। বাবুদের চেষ্টায় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে তাঁহার চাকরী মঞ্জুর হইল।

এক সপ্তাহের মধ্যেই ইতর পল্লী হইতে রোগ ভদ্র পল্লীতে সংক্রামিত হইল। দুইদিন পরেই পীতাম্বর সংবাদ দিলেন যে তাঁহার ছোট ছেলেটীর রাত্রে তিনবার ভেদবমি হইয়াছে।

সংবাদ শুনিয়া নূতন ডাক্তারকে লইয়া রাধানাথ তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাড়ী গিয়া রোগী দেখিয়া আসিল, নূতন ডাক্তারবাবু ঔষধ দিলেন, দ্বিপ্রহরে শোনা গেল ছেলেটী অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। পীতাম্বর আসিয়া রাধানাথকে তাঁহার ধন্যবাদ জানাইলেন।

রাধানাথ ধন্যবাদের প্রত্যুত্তরে বিনয় জানাইয়া বলিল, "বাড়ীতে তো স্ত্রীলোকের মধ্যে আপনার স্ত্রী আর সেই কৈবর্ত্তদের মেয়েটী ছাড়া আর কাউকে দেখলাম না। ছেলেটীর সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটী যেন না হয় দেখবেন।"

পীতাম্বর বলিলেন, "সে আর আপনাকে বলতে হবে না, ডাক্তারবাবু! আমার বউমাটী রয়েছেন, পশ্চিমেই তিনি বাপের কাছে ছিলেন, এই মাসখানেক হোল নিয়ে এসেছি। খুব শক্ত মেয়ে যা হোক। সমানে সব কাজ তিনিই কর্চ্ছেন। তিনি না থাকলে বরং একটু অসুবিধের কারণ হোতো বটে, কিন্তু ভগবানের কৃপায়—"

ডাক্তাররূপী রাধানাথ কি ভাবিতেছিল, পীতাম্বরের কথায় কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না। চুপ করিয়া সম্মুখস্থ উঠানের

দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "ওঃ তা জানতাম না। যাই হোক, তাঁকেও খুব সাবধানে থাকতে বলবেন।"

পীতাম্বর চলিয়া গেলেন।

পরদিন অপরাহ্ন হইতে ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, এমন সময়ে পীতাম্বর ছাতা মাথায় দিয়া আসিয়া ডাকিলেন, "ডাক্তারবাবু!"

রাধানাথ ঘরের ভিতরে বসিয়া একখানি বাঙ্গালা খবরের কাগজ পড়িতেছিল, পীতাম্বরের ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল।

পীতাম্বর চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় উঠিয়া বলিলেন, "উঃ এই বৃষ্টিতেও আসতে হোল।

ব্যগ্রভাবে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন,"কেন বলুন দিকিনি।"

ছাতাটা মুড়িয়া রাখিয়া পীতাম্বর বলিতে লাগিলেন, "আর বলেন কেন সে কথা। আপনারা ডাক্তার মানুষ, কাজেই অসুখ বিসুখ সম্বন্ধে আপনাদের যতটা দূরদৃষ্টি, আমাদের কি আর ততটা হওয়া সম্ভব? কাল সেই যে আপনি বউমাকে খুব সাবধানে থাকার কথা বল্লেন, সেটা একেবারে হাতে হাতে ফলে গিয়েছে।"

রাধানাথ অত্যন্ত চঞ্চলভাবে বলিল,"কেন, কি হয়েছে কি?"

পীতাম্বর বলিতে লাগিলেন, "পরশু রাত্তিরেই নাকি তাঁর খুব জ্বর হয়েছিল, সে কথা আর কাউকে বলেন নি। তাই আমিও টের পাইনি। কাল আপনার এখান থেকে গিয়েই দেখি যে তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। কি ব্যাপার? শুনলাম জ্বর হয়েছে। শেষ রাত্তিরটায় জ্বর কমে এসেছিল বলে আজ সকালে আর আপনাদের কাছে আসিনি, কিন্তু দুপুর বেলা জ্বরটা আবার খুব বেড়ে উঠেছে। ঘরে তো আর থার্মোমিটার নেই যে জ্বরটা মেপে দেখবো। তবে খুব বেশী জ্বর তার আর ভুল নেই। একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়েছেন আর কি। পশ্চিম থেকে এই ম্যালেরিয়ার দেশে এসে দেখুন দিকিনি একবার বিভ্রাটটা। তাই এই বৃষ্টিতেই আসতে হোল।"

রাধানাথ বলিল, "তা, ও ডাক্তার বাবুর কাছে একবার গেলেন না কেন?"

পীতাম্বর বলিলেন, "সেখান থেকেই তো আসছি। কর্ম্ম-ভোগের কথা আর বলেন কেন। ওখানে গিয়ে শুনলাম যে যাদব-পুর থেকে একটা লোক দুপুর বেলা ঘোড়া নিয়ে এসেছিল, তিনি তখনই চলে গিয়েছেন। কখন যে ফিরবেন তার ঠিক নেই। আর তার উপর এই বৃষ্টিতে কি করে যে আসবেন তা তো বুঝিনে।"

রাধানাথের চঞ্চল ভাবটা ক্রমেই ফুটিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "শুধু জ্বর?"

"আপাততঃ তো তাই বোধ হচ্ছে, তবে আজকাল তো আর কিছুই বলা যায় না মশাই। দেখছেন তো চারিদিকের কাণ্ড-কারখানা, মা ওলাবিবি যে কি করবেন তা তিনিই জানেন।

রাধানাথের চক্ষু দুইটা হঠাৎ যেন জ্বলিয়া উঠিল। এই এক মাসের অধিক কাল সে কিসের জন্য, কাহার জন্য এই ডাক্তারীর অভিনয় করিতেছে? হে ভগবান! আজ কি তাই অগ্নি পরীক্ষায় ফেলিলে?

স্কুলে ঝগড়া করিয়া কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন একটা হোমিওপ্যাথিক স্কুলে পড়িয়াছিল, সেইটুকুই তাহার ডাক্তারীর শিক্ষা। সেই শিক্ষাটুকুর উপর নির্ভর করিয়া সে ডাক্তার আখ্যা লইয়া এই বাবুগঞ্জে একমাস কাটাইয়াছে, সামান্য সামান্য অসুখ বিসুখে কোনরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছে বটে, কিন্তু জীবন মরণের পরীক্ষায় সে যে অকৃতকার্য্য হইয়াছে তাহা যেন সেই চাঁড়ালদের ছেলেটী আকাশের অন্তরাল হইতে উচ্চকণ্ঠে আজ তাহাকে শুনাইয়া দিল!

কিন্তু ভাবিবার সময় বেশী ছিল না, তাই সে বাবুদের দেওয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্সটী শুদ্ধ লইয়া সেই বৃষ্টিতেই পীতাম্বরের অনুসরণ করিল।

৭

রাধানাথের জেঠাইমা হরিমোহিনী বহুকাল পরে তাঁর 'বেগুণ ফুল' রাজলক্ষ্মীর এক পত্র পাইলেন।

দুজনেরই বাপের বাড়ী একই গ্রামে, শৈশবাবস্থায় উভয়ে "বেগুণ ফুল" পাতাইয়াছিলেন। হরিমোহিনীর পিত্রালয়ের কেহই জীবিত ছিল না, সেজন্য প্রায় দশ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি আকন্দপোতায় যান নাই, তবে মোক্তারপুরে থাকিয়াও পিত্রালয়ের সংবাদ লইতেন, সুতরাং 'বেগুণ ফুল' রাজলক্ষ্মীর সহিত এতদিন পত্রাদির আদান প্রদান না চলিয়া থাকিলেও, তিনি যে বিধবা হইয়া গত বৎসর হইতে আকন্দপোতায় আছেন, এ সংবাদটুকু হরিমোহিনীর অগোচর ছিল না।

রাজলক্ষ্মী তাঁহার দীর্ঘ পত্রখানিতে আকন্দপোতার শুভ-অশুভ সংবাদ লিখিয়া এবং দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বেগুণ ফুল, পুঁটুরাণী, ভজহরি, খোকা প্রভৃতি যে সকল দুগ্ধপোষ্য শিশু-গুলিকে দেখিয়াছিলেন, তাহারা এখন বড় হইয়া কে কিরূপ লেখাপড়া শিখিয়াছে এবং কাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা গ্রামের জমীদারের মুহুরীও না করিয়া থাকিতে পারেন নাই, তাহার একটী বিস্তৃত বিবরণ লিখিবার পর লিখিয়াছেন, ভাই বেগুণ ফুল, তুমিই না হয় আমাদের ভুলিয়াছ, কিন্তু তাই বলিয়া আমি কি তোমাকে কখনও ভুলিতে পারি? আমার রোজই ইচ্ছা হয় যে

তোমার ওখানে একবার নিজেই যাইয়া না হয় দেখিয়া আসি। ভাই, ছোট বেলাকার ভাব কি ভুল্বার জিনিষ?"

সখী বাৎসল্যে প্রণোদিত হইয়া রাজলক্ষ্মী আকন্দপোতা হইতে মোক্তারপুরে আসিয়া বেগুন ফুলকে দেখিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষার অন্তরালে যে সত্য কারণটি নিহত ছিল, সেটা তাঁহার চিঠির শেষের ভাগটা পড়িলেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

তিনি লিখিয়াছিলেন, "ভাই, দুঃখের কথা জানাইতে হাসিও পায়, কান্নাও পায়। আমার মেয়ে পুঁটুরাণী, যাহাকে তুমি সন্ধ্যাবেলায় কোলে করিয়া দুধ খাওয়াইতে, সে এখনও তোমার কথা রোজ বলে। কর্ত্তা তাহার ভাল নাম রাখিয়াছিলেন লাবণ্যলতা। তুমি যখন তাহাকে দেখিয়াছিলে তখন সে তিন বছরেরটী ছিল, এখন যেটের কোলে তেরয় পা দিয়েছে। আমার যা অবস্থা তোমার তো অজানা নাই। কাজেই মেয়েটী লইয়া যে কি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি, তাহা আর পত্রে কি লিখিব। মেয়েটীর বিবাহের ভার ভাই তোমাকে লইতেই হইবে। তুমি ভিন্ন এ ভার বহন করিবার অন্য লোক তো দেখি না। অনেক-দিন বাপের বাড়ী আস নাই, আমার মাথা খাও ভাই, এবার পূজার সময় একটীবার আসিও, পুঁটুরাণীকে আমি তোমার সঙ্গে মোক্তারপুরে পাঠাইয়া দিব, তারপর তাহাকে তোমারই মেয়ে মনে করিয়া যে ব্যবস্থা হয়—করিও।

চিঠিখানি পড়িয়া হরিমোহিনী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। পুটু নাম-ধারী এই সখী কন্যাটীর কথা মাঝে মাঝে যে তাঁহারও মনে উদয় হইত না তাহা নহে, এমন কি তাহার বিবাহ সম্বন্ধীয় ব্যাপারের একটা কল্পনা তাহার মনের মধ্যে গাঁথা ছিল। তাই, আজ দশবৎসর পরে সেই বেগুনফুল পুটুর বিবাহের কথা পাড়িয়া সে ব্যাপারের সমস্ত ভার তাঁহারই উপর অর্পণ করিয়া নিজের বোঝাটী হাল্কা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়াও তিনি অপ্রসন্ন হইলেন না, বরং দীর্ঘকাল পরে পিত্রালয়ে যাইবার একটা অছিলা ঘটিয়াছে দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন।

তাঁহার ইচ্ছা হইল যে তখনই চিঠিখানার একটা উত্তর লিখিয়া দেন, কিন্তু অনেক সন্ধানে যদি এক টুকরা কাগজ পাওয়া গেল তো কালীর দোয়াত এবং একটা কলমের সন্ধান আর কিছুতেই পাওয়া গেল না। সুতরাং পত্রের উত্তর দানের ইচ্ছাটা আপাততঃ মনেই পোষণ করিয়া চিঠিখানি লইয়া একেবারে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

বিনোদ চৌধুরী তখন অন্তঃপুরে তাঁহার বসিবার ঘরটীতে বসিয়া একটা ডিক্রী জারি করিতে দিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য উকিলকে চিঠি লিখিতেছিলেন, এমন সময়ে স্ত্রী আসিয়া সেই মস্ত চিঠিখানি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "এই পড়ে দেখ।"

বিনোদ বিহারী মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কোথাকার চিঠি ?"

গৃহিণী বলিলেন, "আমার বেগুনফুলের !"

'বেগুনফুল' সম্পর্কীয় স্ত্রীর এই বাল্য সখীটীর সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতি ততটা উজ্জ্বল ছিল না, কাজেই একটু বিস্মিত হইয়া এই লেখিকাটীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন !

স্ত্রী তাঁহার স্মৃতিশক্তির প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়া বেগুন-ফুলের পরিচয় বর্ণনা করিলেন। বিনোদ চৌধুরীর তখন সব কথা মনে পড়িল। তিনি বলিলেন, "লিখেছেন কি ?"

স্ত্রী বলিলেন, "পড়েই দেখনা কেন।"

অতবড় চিঠিখানি আগাগোড়া পড়িবার ধৈর্য্য তাঁহার ছিল না, কাজেই একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিলেন, "হুঁ, তাঁর মেয়েটীর কথা লিখেছেন বুঝি ?"

স্ত্রী বলিলেন, "হাঁ, আর চিঠির শেষের দিকটা দেখলে না বুঝি ?"

বিনোদবিহারী হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, দেখেছি বই কি তোমাকে নেমন্তন্ন করেছেন, তা যাও, একবার ঘুরে এসো। তবে ম্যালেরিয়ার সময়টা, বেশীদিন সেখানে থাকা আমি কিন্তু সঙ্গত বলে মনে করি নে।"

স্ত্রী বলিলেন, "মেয়েটিকে কিন্তু আমার সঙ্গে নিয়ে আসবো।"

"তারপর ?"

"তারপর আবার কি? তুমি কি মনে কর যে আমি তার বিয়ের কথা না ভেবেই তাকে এখানে নিয়ে আসবার কথা বলেছি।"

বিনোদবিহারী বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সে কি কথা গো। এই তো একঘণ্টা হোল চিঠিখানা পেয়েছ। এরই মধ্যে আবার কোথায় বিয়ের কথা ভাবলে?"

স্ত্রী তখন কথাটাকে পাড়িলেন। বলিলেন, "দেখ, তোমাকে আমি বিশ দিন পর পর করে বলেছি, তুমি ত তাতে কাণ দেবে না! ছেলেটার মা নেই, বাপ নেই, মাথার উপরে থাকবার মধ্যে কেবল আমরাই আছি। আমরা যদি তাকে না দেখি, তাকে ভাল পথে আনতে না চেষ্টা করি, তা হলে কে করবে! তুমি বকাবকি করলে, সেই দুঃখে কোথায় যে সে গেল, তার কোন খোঁজও নিলে না, খবরও না। ধন্তি বলি তোমার মন!"

কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথাটা বলা হইল তাহা বিনোদ-বিহারীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন, "আমি কি সেটা বুঝিনি মনে করেছ? কিন্তু এটা তোমার বোঝবার ভুল যে আমার বকাবকিতেই সে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। আমার নিজের ছেলে পুলে নেই, সে যদি ভাল ভাবে থাকে, তা হলে সবই তো তারই। তবে বদখেয়ালীতে উড়িয়ে দেবার জন্যে ভদ্রাসনের অর্দ্ধেক বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করবার প্রবৃত্তি তার

যখন হয়েছে, তখন তার একটু শিক্ষা হওয়া দরকার। অবিশ্যি সে ডিক্রীর টাকা আমি মিটিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তার আক্কেলটা দেখেছো তো——"

স্ত্রী বলিলেন, "তা ছেলেমানুষ, বুঝতে না পেরে——"

বিনোদবিহারী বলিলেন, "কিন্তু অমন চোরের মত পালিয়ে যাবার কি দরকার ছিল? আমি কি তার খোঁজ করতে কসুর করেছি? কলকাতার তার আলাপী যতগুলি লোক ছিল, সকলেরই কাছে খবর নিয়েছি, সেখানে সে যায়নি। সাত পাঁচ ভেবে আর পুলিসে খবরটা দিইনি, কিন্তু এখনও সে যদি ফিরে এসে আবার ভাল হয়ে থাকতে চেষ্টা করে, তা হলে আমি তাকে সংসারী করবার জন্যে যতটা পারি তা করবো। সত্যি কথাই তো, তার মাথার উপরে থাকবার মধ্যে তো কেবল আমরাই আছি! তবে, চৌধুরী বংশের নামটা যাতে না ডোবে সেটাও তো দেখতে হবে।"

হরিমোহিনী চুপ করিয়া রহিলেন। বিনোদবিহারীর শাসন যতই কঠোর হোক না কেন, রাধানাথকে যে তিনি আন্তরিক স্নেহ করিতেন, সে খবরটুকু তাঁহার অগোচর ছিল না।

বিনোদবিহারী বলিতে লাগিলেন, "তুমি বুঝি তোমার বেগুনফুলের মেয়ের বিয়ে রাধানাথের সঙ্গে দেবে মনে করেছ?"

হরিমোহিনী বলিলেন, "হাঁ, কিছু অন্যায় মনে করেছি কি?"

বিনোদবিহারী বলিলেন,—"না, অন্যায় নয়, তবে আকাশ-কুসুম। সে রইলো কোথায় তার ঠিক নেই, তুমি এদিকে তার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে পাগল হয়ে বেড়াচ্ছ!" বলিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

হরিমোহিনী বলিলেন, "সত্যি সে কি আর ফিরে আসবেই না! যেখানেই থাক্, জন্মস্থানের মায়া ত্যাগ করে সত্যি ত আর একেবারে চলে যেতে পারবে না।"

বিনোদবিহারী সে কথায় আর কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া, ডিক্রী জারীর ব্যাপার সম্বন্ধে উকিলকে যে চিঠিখানি লিখিতেছিলেন, সেখানি সম্পূর্ণ করিতে মনঃসংযোগ করিলেন।

৮

বনমালার যখন জ্ঞান হইল, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। ক্ষুদ্র কক্ষটীতে একটী কেরোসিনের চিমনি জ্বলিতেছিল এবং শয্যার পার্শ্বেই একখানা টুলের উপর ডাক্তারবাবু ওরফে রাধানাথ তাহার ঔষধের বাক্সটী কোলে লইয়া বসিয়াছিল। পীতাম্বর ও তাঁহার স্ত্রী এতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সবে মাত্র শয়ন করিতে গিয়াছেন, ঘরের মেঝেয় পড়িয়া বাড়ীর দাসী সুধোর মা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল।

চোখ মেলিয়া বনমালা একবার গৃহের চারিদিকে চাহিল। প্রবল জ্বরের তাড়নায় তাহার মাথার মধ্যে যে একটী গুরুভার

অনুভূত হইতেছিল সেটা তখন সারিয়া গেছে এবং জ্বর থাকিলেও অন্যান্য যন্ত্রণার অনেকটা উপশম হওয়াতে শরীরটা হালকা বোধ হইয়াছে।

রোগিনীকে চোখ মেলিতে দেখিয়া ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি তাহার ঔষধের বাক্সটা খুলিয়া একটা শিশি বাহির করিয়া, ঘরের কুলুঙ্গিতে যেখানে কাঁচের গ্লাস ও জলের ঘটিটা ছিল, সেখানে যাইয়া একবিন্দু ঔষধ গ্ল্যাসে ঢালিয়া ধীরে ধীরে শয্যার দিকে অগ্রসর হইল। সন্ধ্যার সময় সে অনেক ভাবিয়া যে এক ফোঁটা ঔষধ দিয়াছিল, তাহার উপকার দেখা গিয়াছে বুঝিয়া তাহার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

ঔষধ শুদ্ধ গ্ল্যাসটী অগ্রসর করিয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "এখন একটু সুস্থ বোধ হচ্ছে কি? এই ঔষধটী এইবার খেতে হবে।"

বনমালা একটু যেন সঙ্কুচিত হইয়া ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া ঔষধের গ্ল্যাসটী লইল; ডাক্তার দুইপদ পিছাইয়া গেল, দেওয়ালের আলোটায় এইবার সম্পূর্ণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই, মুহূর্ত্ত-কাল যেন আড়ষ্টভাবে বসিয়া থাকিয়া, পরমুহূর্ত্তেই শিহরিয়া উঠিল। তাহার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত হঠাৎ যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল, এবং একটী কালো যবনিকা যেন হঠাৎ তাহার সম্মুখে পড়িয়া গিয়া তাহার দৃষ্ট বস্তুটীকে এক

মুহূর্ত্তে চক্ষুর অন্তরাল করিয়া দিল, এবং সেই সঙ্গে কিছুকাল পূর্ব্বের স্মৃতিটা বড়ই উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিল।

বনমালা দেখিল ডাক্তারবাবু একদৃষ্টিতে তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন এবং সেই দুটী চক্ষু হইতে যেন দুটী অগ্নিরেখা বাহির হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিয়া দিতেছে। সে আবার শিহরিয়া উঠিল, এবং পরমুহূর্ত্তে সভয়ে, সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "স্বামীজি! আপনি!"

ডাক্তার দেখিল যে বনমালার মুখখানি হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল এবং রুক্ষভাবে ডাক্তারের প্রতি চাহিয়া বলিল, "কবে ডামমগপুর থেকে এখানে এসে——এ রকম কেন?"

এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর ছিল না, সুতরাং ডাক্তার নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার নিঃশ্বাস বড় ঘন ঘন পড়িতে লাগিল।

বনমালা আরও উত্তেজিতভাবে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কেন এসেছেন তা আপনি না বললেও আমি বুঝতে পারিনি, তা ভাববেন না। ছিঃ আপনি না সন্ন্যাসী সেজে ছিলেন, আপনি না সাধু! ছিঃ আপনি এত নীচ তা জানতাম না! আপনি কি জানেন না যে আমি বিধবা, হিন্দুর ঘরের বিধবা! আপনাকে আর কি বলবো বলুন, আমারই অদৃষ্টের দোষ,

কিন্তু আপনি যদি মানুষ হন, তা'হলে আর আমার সামনে দাঁড়াবেন না। যান, চলে যান!" বলিয়া একটা অস্বাভাবিক রকমের চাৎকার করিয়া ঔষধশুদ্ধ সেই কাঁচের গ্ল্যাসটা সশব্দে মাটীতে ফেলিয়া দিল।

ডাক্তার হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তাহার সেই উদ্যত হাতখানি ধরিয়া বাধা দিতে গেল, কিন্তু গেলাসটী তখন হাত হইতে ঠিকরিয়া গিয়া ভূমিতলে নিদ্রিতা সুধোর মার গায়ে গিয়ে পড়িয়াছে এবং সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়াই "ওগো বাবাগো" বলিয়া এমন এক চীৎকার করিয়া উঠিল, যে পার্শ্বের কক্ষ হইতে পীতাম্বর ও তাঁহার স্ত্রী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া সেই ঘরে যখন আসিয়া পড়িলেন, হতভাগ্য ডাক্তার তখনও বনমালার উদ্যত হাতখানি ধরিয়া আছে।

দ্বারপ্রান্তে পীতাম্বর ও তাঁহার স্ত্রী নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, সুধোর মা তখনও আসল ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া মেঝের উপর ভগ্ন গ্ল্যাস খণ্ডগুলির প্রতি চাহিয়াছিল। এবং ডাক্তার আস্তে আস্তে যখন বনমালার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া দুই পদ পিছাইয়া আসিল, তখন সে 'মাগো!' বলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া শয্যার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

ডাক্তার ওরফে রাধানাথ ওরফে স্বামীজি আরও কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত পৃথিবীটা যেন তাহার পায়ের তলা দিয়া সরিয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হইল; তার পর পীতাম্বরের পাশ দিয়াই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিল।

সমস্ত আকাশ খানি তখনও কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন ছিল, এবং তাহারই অন্তরাল হইতে বিদ্যুতের মুহূর্ত্তকালীন তীব্র আলোক-রেখা চোখ ঝলসিয়া দিয়া তাহার এই উদ্দেশ্যহীন ব্যথিত জীবনটাকে যেন কোন অনির্দ্দিষ্ট সুদূরের রাস্তা দেখাইয়া দিল।

৯

মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই অন্ধকারে রাধানাথ কোন রকমে তাহার বাসায় ফিরিল। আলো জ্বালিতে আর প্রবৃত্তি হইল না, সেই অন্ধকারেই হাতড়াইয়া কোন রকমে বিছানাটীর নিকট যাইয়া ধপ্ করিয়া তাহাতে শুইয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বশরীর তখনও প্রতিমুহূর্ত্তে রোমাঞ্চিত হইতেছিল, মাথা এবং চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল। প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলে লোকের সর্ব্বশরীর যেরূপ উত্তাপে রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহারও সেইরূপ হইতেছিল।

আজ সে এ কি করিল! এক মুহূর্ত্তের এতটুকু দুর্ব্বলতার

পরিণাম কোথায় কি ভাবে গিয়া দাঁড়াইবে তাহা সে অনেক ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিল না।

মাথার কাছে যে জানালাটা ছিল, সেটী খুলিয়া দিতেই ঠাণ্ডা হাওয়ার একটা বেগ ঘরের ভিতর আসিয়া তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের উপর একটু শীতলতার রং বুলাইয়া গেল। শয্যায় শয়ন করিয়াই আকাশের কিয়দংশ দেখা যায়, তাহাতে সে দেখিল যে বৃষ্টিটা ইতিমধ্যে কখন থামিয়া গেছে এবং ছিন্ন-বিছিন্ন মেঘের অন্তরাল হইতে জ্যোৎস্নার আলো এক একবার চোরের মত উঁকি মারিয়াই আত্মগোপন করিতেছে।

তাহার বক্ষঃপঞ্জরের ভিতরে যেন একটী আগুনের শিখা তাহার অপরাধের শাস্তি দিবার জন্যই সেখানটা দগ্ধ করিয়া দিতেছিল, সেই অগ্নিশিখার তীব্র আলোকে তাহার জীবনের অতি ক্ষুদ্র ঘটনাগুলিকেও সেই রাত্রে অত্যন্ত সজীব হইয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, সেই সেদিনের কথা—যেদিন পীড়িত হইয়া সে সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধেশ্বর বাবুর বাসায় সন্ন্যাসীবেশে আশ্রয় লইয়াছিল, তখন তাহার শিয়রে বসিয়া সেই সে সেবারতা নারী শারিরীক সমস্ত কষ্টকে উপেক্ষা করিয়া প্রাণপণে তাহাকে রোগমুক্ত করিয়া তুলিতেছিল, সেই নারীই কি আজ উদ্যতফণা সর্পিনীর ন্যায় কঠোরভাবে তাহাকে দূরে সরিয়া যাইবার আদেশ দান করিল! যে শিখা

একদিন প্রদীপরূপে জ্বলিয়া অন্ধকার ঘরকে আলোকিত করিয়াছিল, সেই শিখাই যে আজ আবার একদিনে ঘরে আগুন ধরাইয়া দিয়া গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া পথে বসাইতে পারে এ কল্পনা প্রদীপশিখা দেখিয়াই মনে করিতে পারে!

মনটা একটু সুস্থির হইলে রাধানাথ ভাবিল, যে বিধাতা তাহাকে আসক্তির যে রূপ দেখাইলেন, তাহা তাহার কল্পনার অতীত, স্বপ্নের অতীত, আজ উহা তাহার কল্পনায় মোহন স্বর্গের সোণার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়া দেখাইয়া দিল যে আসক্তির স্বরূপ স্থির নয়, শান্ত নয়—বিদ্যুৎস্ফুরণের মত উহা তীব্র এবং জ্বালাময়। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত উহা উত্তাপের বীজ বপন করিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু দগ্ধ করিতেও উহার মুহূর্ত্তের বেশী বিলম্ব করিতে হয় না!

একটু ঘুমাইতে পারিলে বোধ হয় তাহার মনের বোঝা অনেকটা হাল্কা হইত, কিন্তু নিদ্রার চেষ্টা করিতেও সে পারিল না। জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি একে একে সারিবন্দী হইয়া যখন তাহার মনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সে অতীতকালটার দিকে চাহিয়া বড়ই ম্রিয়মান হইয়া উঠিল।

হায় গো! আজ কোথায় তাহার সেই বাল্যের ক্রীড়ানিকেতন, সেই নির্ভাবনার দিনগুলি, কোথায় তাহার পিতামাতার স্নেহধারার মধুর স্মৃতিটুকু! কিসের উন্মাদনায় সে সব

ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছে। কোন গ্রহের উপগ্রহ তাহাকে ঘর ছাড়িয়া পরবাসী করিয়া তুলিয়াছে! পূর্ব্বে সে যেন ম্যাপে আঁকা সমুদ্র দেখিয়া মনে করিয়াছিল যে ইহাতে ঝাঁপ দেওয়া বড়ই সহজ, সাঁতার দিয়া পার হওয়া এতটুকু শক্ত নয় এবং আনন্দও তাহাতে যৎপরোনাস্তি আছে। কিন্তু এতদিন পরে সে যেন সত্য সত্যই সমুদ্রের মাঝখানে আসিয়া বুঝিয়াছে যে ইহা ফাঁকি নয়, চিত্রের জলের মত ইহা স্থিরও নয়, শান্তও নয়, ইহার তরঙ্গ যেমনি উত্তাল—তেমনি আশঙ্কাজনক।

সমুদ্রের মাঝখানে পড়িয়া আজ তাহার তীরে ফিরিবার বড়ই আগ্রহ জন্মিল। মাটীতে পা দিবার আনন্দ যে কতখানি তাহা দীর্ঘকাল যে গভীর জলের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়াছে সেই বেশী বোঝে।

রাধানাথ স্থির করিল যে, আর নয়! উদ্দেশ্যহীন এই জীবনের অনেক অঙ্ক গর্ভাঙ্ক ইহারই মধ্যে অভিনীত হইয়া গিয়াছে, এইবার ইহার যবনিকাখান ফেলিতেই হইবে। সন্ন্যাসী হইয়া দুর্ব্বিসহ কষ্টকেও সে সহ্য করিয়াছে, ডাক্তারীর ছলে অভিনয় করিতে গিয়াও তাহার অকৃতকার্য্যতা প্রতিপদে ধরা পড়িয়াছে। এইবার ছদ্মবেশের আবরণ হইতে আসল মানুষটাকে বাহির করিবার চেষ্টা করিতেই হইবে।

মোক্তারপুরের কথাটা সে ভাবিয়া দেখিল। তাহার

গৃহখানি দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে কিনা তাহা সে জানেনা, কিন্তু যাহাই হইয়া থাকুক, সেখানে সে একবার যাইবেই। জ্যেষ্ঠতাতের প্রকৃতিটা তাহার অজ্ঞাত ছিলনা, সে মরুভূমির বালুকার তলদেশে যে স্নেহের সাগর ছিল তাহাও সে জানিত, সুতরাং স্থির করিল যে মোক্তারপুরে যাইয়া একবার জ্যেষ্ঠতাতের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। তারপর সেখানকার অবস্থা বুঝিয়া ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই চিন্তাটার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত দেহমনের ভিতর দিয়া আবার যেন একটা বৈদ্যুতিক কম্পনের সাড়া দিয়া উঠিল। সে শয্যা হইতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিল। বাবুদের একটা পাইক চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় রাত্রে আসিয়া শুইয়া থাকিত। তাহার নাসিকাধ্বনি তখনও শোনা যাইতেছিল।

রাধানাথ যখন তাহাকে জাগাইল, তখন সে বিস্মিত হইয়া ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিয়া দেখিল যে সেই অসময়েও তিনি কালোরঙের কোটটা পরিয়া মোজা পায়ে দিয়া, ছাতাটা হাতে করিয়া যেন কোথায় বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

রাধানাথ তাহার হাতে দুইটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—"দাসু, এই নে তোর ছেলেকে সন্দেশ খেতে দিস্। কাল বাবুদের কেষ্টকে ডাকিয়ে জিনিষ পত্তরগুলি বুঝিয়ে দিস

সবই রইল—বেশী কথা কইবার সময় নেই, এই এগার মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে কাটোয়ায় ভোরের ট্রেণে ধরতে হবে।" বলিয়াই দাদুকে কোন কথা কহিবার অবসর না দিয়াই ডাক্তার ত্বরিতপদে রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল।

১০

সেদিনকার ঘটনার তলদেশে যে একটা আন্দোলনের আগ্নেয়গিরি স্ফুরণোন্মুখ হইয়া আছে, তাহা একটু সুস্থ হইয়াই শাশুড়ী ও অন্যান্য সকলের ব্যবহারেই বনমালা বুঝিতে পারিল।

তিনদিন জ্বরভোগের পর সে সুস্থ হইয়া উঠিল, কিন্তু ইহারই মধ্যে বাড়ীতে সকলেরই মুখে একটা বিরক্তির ভাব যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার চক্ষু এড়াইল না। সেদিন রান্নাঘরে শাশুড়ী রন্ধন করিতেছিলেন এবং সুখোর মা বসিয়া তরকারী কুটিতেছিল, এমন সময়ে বনমালা বিনা আহ্বানেই সেখানে আসিয়া সুখোর মাকে বলিল,—"সর সুখোর মা, আমিই না হয় শাকগুলো বেছে দিচ্ছি।"

কিন্তু গৃহিণী মুখখানি খুব ভারি করিয়া বলিলেন, "থাক, থাক, বাছা, তোমার আর বেছে দিয়ে কাজ নেই। আচ্ছা সুখোর মা, ওই একমুঠো শাক নিয়ে সেই কোন বেলায় বসেছিস, এখনও কি ওগুলো বেছে দেওয়া শেষ হোল না! ধন্যি বলি

তোর বেগার ঠেলা কাজকে। আজ হারুর পিসি থাকলে আমাকে আর কিছুই দেখতে শুনতে হোত না!" বলিয়া ইতিপূর্ব্বে গ্রামের হারুর পিসী নাম ধারিণী কোন রমণী তাঁহা-দের বাড়ী পরিচর্য্যা করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে থাকিতে দেন নাই, সেই দুঃখ আজ তাঁহার মনে উথলিয়া উঠিল।

কিন্তু তথাপি বনমালা সেখানে বসিল দেখিয়া, তাহার শাশুড়ী মুখ ভারি করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হাতের হাতাখানি উনানের কড়াতে খুব জোরে লাগিয়া ঠন্‌ঠন্ করিয়া উঠিল, কাঁসিখানি লইয়া যখন মাটীতে রাখিলেন, তখন তাহা মহাশব্দে ঝন ঝন করিয়া বাজিয়া উঠিল, কড়ায় যে তরল পদার্থটা টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল, তাহাকে হাতা দিয়া নাড়া দিবা মাত্রই তাহা ছিটকাইয়া উঠিয়া গৃহিণীর মুখে লাগিল, তিনি একটী অস্বাভাবিক রকমের করুণ চীৎকার করিয়া জানাইলেন যে এত লোকের মরণ হয় তাঁহার বেলাই কি যম একেবারে—"

সুধোর মা তাড়াতাড়ি আহাঃ হা করিয়া দগ্ধস্থানে একটু চুণ আর তৈল দিবার পরামর্শ দিল, কিন্তু গৃহিণী তাহাতে ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—"থাক থাক সুধোর মা, তোর আর ডাক্তারী করতে হবে না।" বলিয়া সেই ক্ষুদ্র ক্ষতটুকুতে সস্নেহে নিজেই হাত বুলাইয়া উহু উহু করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই সব বিরক্তির অন্তরালে যে আসল কথাটুকু চাপা ছিল, তাহা আর বেশীক্ষণ চাপা রহিল না। সম্মুখস্থ উনানটার নির্ম্মাণ কৌশলের নিন্দা করিয়া, সুখোর মার শাক বাছিবার প্রণালীকে ধিক্কার দিয়া অবশেষে বলিলেন, "বলি বউমা, কি কাণ্ডটা বল দিকিনি।"

বনমালা তখনও স্থিরভাবে কাঠের পুতুলের মত বসিয়া ছিল, বলিল, "কিসের কাণ্ড মা?"

"কিসের কাণ্ড! অবাক করলে যে তুমি বাছা! আমি তো আর নেকী নই, কচি খুকীও নই যে কিছু বুঝতে পারি নে।"

ইঙ্গিতটা যে কোনখানে তাহা বনমালার বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু তথাপি সে বলিল, "কিসের কথা বল্‌ছেন?"

"কিসের কথা বলছি? আচ্ছা বাপু, আমার শতেক ঘাট হয়েছে, জিজ্ঞাসা করেছি। আর যদি কখনও বলি তখন বলো।" বলিয়া গৃহিণী কতকটা আপন মনেই বলিতে লাগিলেন "কর্ত্তাকে তখন দু হাজার বার বারণ করেছিলুম যে থাক আর কাজ নেই, ছেলেই যখন চিতের আগুণে পুড়ে ঝুড়ে গেছে, তখন আর কাজ নেই। তা, তখন আমার কথা কাণে তোলা হোলো না, বউমা বলতেই অজ্ঞান, এখন তেমনি হলো, বেশ হোলো। আমার কথা কইবার দরকার কি বাপু! তবে সংসারে থাকতে গেলেই বলতে হয়।" বলিতে বলিতে রান্নাঘরের একটা কুলুঙ্গি

হইতে বিস্কুটের একটা পুরাতন টিনের মধ্যে কি কতকগুলা মসলা পাতি ছিল, সেগুলিকে অতি ব্যস্তভাবে যেমন পাড়িতে গেলেন, অমনি টিনশুদ্ধ মাটীতে পড়িয়া গিয়া তাহার ভিতরের জিনিষগুলি সব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

গৃহিণীর চক্ষু হইতে এইবার জলধারা নামিল।

ভাষার নানাবিধ ঝঙ্কারে নিজের মৃত্যুকামনা দেবতার পদে বারংবার জানাইয়া, পিতৃকুলে যে ভ্রাতা কখনও খোঁজ খবর লন না, তাঁহার দুর্ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করিয়া, অনেকক্ষণ পরে থামিলেন।

প্রকৃতির এই ঝটিকা একটু থামিলে সুধোর মা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি হ্যাঁগা বউমা, ও ডাক্তার বাবুটীর সঙ্গে কি তোমার আলাপ পরিচয় আছে না কি ?"

বনমালার বুকের ভিতরটা যেন হঠাৎ ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিল। সুধোর মার কথার কোন উত্তর না দিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল। সুধোর মা কোন উত্তর না পাইয়া পুনরায় বলিল, "হ্যাঁগো, ও বৌমা, শুনছো—"

গৃহিণী পুনরায় সপ্তমে ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "চুপ করে থাকতে না পারিস্ যদি, তবে উঠে যানা কেন সুধোর মা। ডাক্তারের সঙ্গে চেনা পরিচয় থাকুক আর না থাকুক তোর সে খবরে দরকার কি ? কুম্ভকর্ণের মত ঘুমিয়েই অজ্ঞান, ডাক্তারের

সঙ্গে দুঘণ্টা ধরে কথাবার্ত্তা কওয়া হোল, ডাক্তার চেনা নয় আবার অচেনা—যা যা তোর আর জিজ্ঞেস করতে হবে না, উঠে যা বাপু আর সহ্য হয় না আমার এ পোড়ানির শরীরে। অদেষ্টে এইটুকু বাকী ছিল, সেটুকুও হোল।"

সুধোর মা আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু গৃহিণীর চক্ষের দিকে চাহিয়াই থামিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া গৃহিণী নিজেই বলিতে লাগিলেন, "এর ভেতরে যে এত, তা আর আমরা কি করে জানবো বল। এখন সব কথা তলিয়ে বুঝতে পারা যাচ্ছে। ওমা, যেদিন সেই পশ্চিম থেকে বউ নিয়ে আসা হোল, তার দশ দিন না যেতে যেতেই ওমনি গাঁয়ে ডাক্তার এলেন লোকের উপর দয়া করতে। আবার কর্ত্তার আবার আদিখ্যেতা কত! ডাক্তারের সুখ্যাতি আর মুখে ধরে না। এইবার ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে, কিছু বলবো না তো আমি। কুলে কালিই পড়ুক আর যাই হোক।"

বনমালা এতক্ষণ নীরবে এই বক্তৃতা শুনিয়া যাইতেছিল, এবার তাহার আর সহ্য হইল না। তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া যেন জল বাহির হইতে চাহিল। সে বলিল, "কেন মা, আমি কি করেছি?"

গৃহিণী সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কিছুমাত্র আবশ্যকতা বোধ করিলেন না, উনানে চাপানো যে তরকারীটা টগবগ করিয়া

ফুটিতেছিল, তাহারই প্রতি সহসা অত্যন্ত বেশী করিয়া মনঃসংযোগ করিলেন।

সুধোর মা সে কথার উত্তরে বলিল, "আর মা, কি করেছ, তার আর বলবো কি। এ দুটো দিনেই গাঁ ময় ঢি ঢি পড়ে গিয়েছে। আমারই মরণ, কখনও কোন কথা কারু কাছে দুঠোঁট এক করে বলিনে, সেদিন বলতে গেলুম—ওপাড়ার মুখুয্যেদের বড় গিন্নির কাছে, সেই মাগীই তো এতখানি রটনা রটিয়েছে।"

বনমালার নিঃশ্বাসটী হঠাৎ যেন বন্ধ হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। সে বলিল "কি রটিয়েছে" ?

গৃহিণী তীব্রস্বরে পুনরায় সুধোর মাকে স্থির হইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু সে বলিতে লাগিল, "মুখুয্যেদের বড় গিন্নীর কথা আর কেন বল মা, শোনে যদি একখানা, তা লোকের কাছে বলে বেড়াবে দশখানা। আমি মরতে সেদিন বললুম যে মুখুয্যে গিন্নী, কারুকে বল না যেন, এই রকম সেদিন রাত্তিরে আমাদের বউ ঠাকরুণ ডাক্তার বাবুর হাত ধরে—না বাবা আর বলবো না। "আমি ছোট লোক, আমার ও সব কথায় দরকার কি বাপু। আদার ব্যাপারী আমি, আমার জাহাজের খোঁজে দরকার কি ?"

বনমালা একটু তীব্রভাবে বলিল, "বল, বল, থামলি কেন, ডাক্তার বাবুর হাত ধরে কি করেছি বল ?"

সুধোর মা বলিবার পূর্ব্বেই গৃহিণী বলিলেন, "কি করেছ, তা তুমিই জান। ছিঃ ছিঃ, ঘরের কলঙ্ক বংশের কলঙ্ক, সমাজে মুখ পাবার যো নেই, লোকের কাছে উচু মাথা হেঁট, মাগো আমার মরণটা হলে যে বাঁচি।" বলিয়া গৃহিণী দ্রুত পদক্ষেপে রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বনমালা সুধোর মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তা, মুখুয্যে গিন্নী পাড়ায় কি রটিয়েছে শুনি?"

সুধোর মা বলিল, "আর লজ্জা দিও না বৌঠাকরুণ আমরা ছোট লোক, গরীব লোক, আমাদের সে কথায় কাজ কি মা, যা রটিয়েছে সেই রটিয়েছে, আমি কেবল বলে দোষী হয়েছি মা। কি রটিয়েছে সে কথা কি আর বলবার? ও পাড়ার ছোঁড়ার দল তো কালই গিয়ে ডাক্তারকে গোবেড়েন করে মারবে বলে বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে শোনে যে পোড়ার মুখো ডাক্তার সেই রাত্তিরেই পালিয়েছে। দাশু বাগ্দী দাওয়ায় শুয়ে ছিল, তার হাতে বুঝি দুটো না কটা টাকা দিয়ে সেই রাত্তিরেই একেবারে ছুট। আর, না পালালেই বা করে কি? পোড়ার মুখ দেখাবে কি করে গাঁয়ের এত ভদ্দর লোকের মাঝখানে?"

বনমালার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার রুগ্ন শরীরে যে আঘাতটা বাজিল, তাহা বজ্রের চেয়ে কম নয়।

সুধোর মা বলিতে লাগিল "চুপ কর মা, চুপ কর, আর কেঁদে টেঁদ না, আবার তোমার শাশুড়ী দেখলে রসাতল করবে'খন। আহা, তা আর মানুষের জন্মে মানুষের কষ্ট হয় না, কষ্ট তো হবে বটেই। তা যাক্ মা, চোখটা মুছে ফেলে দাও।" বলিয়া মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া সে আবার বলিল, "আবার না জিজ্ঞেস করেও বাঁচি নে। তা, হ্যাঁগা বৌ-ঠাকরুণ, তোমার সঙ্গে কোথায় ওঁর আলাপ হয়েছিল? বাপের বাড়ীতেই বুঝি? আহাঃ ছোটবেলাকার ভাব সাব সে কি সহজে ভোলা যায় মা? লোকে কথায় বলে—"

বনমালা এবার সহসা মস্তক উন্নত করিয়া বলিল, "সুধোর মা তুই থাম বলছি।"

সুধোর মা থামিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার রাগও করিল। বলিল, "এই থামলুম গো বাছা, আর যদি কথা কই তো ঝাঁটা মের আমার মুখে। দরকার কি বাপু আমার সব কথায়। তোমার ধর্ম্মে যা বলবে তুমি তাই করবে, তাতে কার কথা কইবার দায় পড়েছে। পোড়া কপাল, আমাদের হলে তো গলায় কলসী দিয়ে গঙ্গায় ডুবে মরি। কথায় বলে—

সুনাম গেল যার
রইলো কিবা তার—"

বলিতে বলিতে সুধোর মাও রান্নাঘর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

১১

সেদিন এতটুকু আহার্য্য দিয়াও কেহ বনমালার রুগ্ন শরীরটার খোঁজ লইবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিল না। শাশুড়ী বাক্যালাপ করিলেন না, সুধোর মাও হঠাৎ বড় গম্ভীর হইয়া পড়িল। দ্বিপ্রহরে পীতাম্বর আহারে বসিলে সুধোর মা একবার আসিয়া কেবল বলিয়া গেল, "বৌ-ঠাকরুণ, ও ঘরে কর্ত্তাবাবু খেতে বসেছেন, তুমি যেন এখন ও ঘরে গিয়ে কিছু ছুঁয়ে টুয়ে ফেলো না!"

এই কথাটাতে তাহার বুকের ভিতরটা যেন একেবারে পুড়িয়া গেল। উঃ ভগবান! সে এমন কি পাপ করিয়াছে যাহার জন্য একদিনের মধ্যেই সে ইতরের অপেক্ষাও অস্পৃশ্য হইয়া গেল, শ্বশুর যে ঘরে আহার করিতেছেন, সে ঘরে তাহার প্রবেশ করিয়া কিছু স্পর্শ করিবার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত রহিত হইয়া গেল! এ শাস্তি যেন বজ্রের মত তীব্রভাবে আসিয়া তাহার হৃদয়টাকে কেবল যে আঘাত করিল তাহা নহে, একেবারে সেখানটা যেন দগ্ধ করিয়া দিল। যে অপরাধে তাহার এমন কঠিন দণ্ডবিধান হইয়া গেল, সেটা যে কতখানি গুরুতর অপরাধ, তাহা ভাবিয়া তাহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল।

গৃহের দ্বারটী বন্ধ করিয়া দিয়া, সেই রুদ্ধ গৃহের মেঝেয় সে শুইয়া পড়িল। চক্ষের জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া যখন মাটীর

খানিকটা স্থান ভিজাইয়া দিল, তখন সে শুষ্ককণ্ঠে বক্ষ চাপিয়া বলিয়া উঠিল, "মা গো!"

যে দিন এই বাড়ীর এই ঘরটীতে সে প্রথম বধূরূপে আসিয়াছিল, সেই দিনের স্মৃতিটা আজ তাহার মনের মধ্যে বড় উজ্জ্বল-ভাবে ফুটিয়া উঠিল। সেই দিন তাহার ইহ জীবনের সকল শুভাশুভের ভার লইয়া যে তাহাকে এই গৃহে আনিয়াছিল, সেই —তাহার স্বামী আজ কোথায়? গৃহের মধ্যে এখনও তাঁহারই হাতে সাজানো ছবিগুলি, সেই পুতুলগুলি ঠিক তেমনি ভাবে রহিয়াছে, কেবল সেই গৃহদেবতাই আজ নাই! দেবতাহীন শূন্য মন্দিরের মধ্যে আজ সে বড় অভাগিনীরূপে একাকিনী!

স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এ বাড়ীতে তাহার জীবনের কেন্দ্রটীও যে কখন অদৃশ্যভাবে সরিয়া গিয়াছে, তাহা সে এতদিন বুঝিতে পারে নাই, আজ যেন সেই ভ্রমটুকু তাহার বড় বেশী করিয়াই বাজিল। আজ তাহার নষ্টভাগ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কে যেন দেখাইয়া দিল যে যাহা সরিয়া গিয়াছে আর তাহা পূর্ব্বস্থানে আসিবে না, যাহা হারাইয়াছে, আর তাহা ফিরিবে না, শতচেষ্টাতেও না!

সমস্ত দিনমানটা কাটিয়া গিয়া, সন্ধ্যার অন্ধকার দেখা গেল। সুখোর মা কেবল একবার একটা জানালার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া গিয়া গৃহিণীকে জানাইয়া দিল যে বৌঠাকরুণ ঘুমা-

ইয়াছেন, তাহাতে গৃহিণীর মনটা আরও তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুধোর মাকে তিনি ভৎ´সনা করিয়া বলিলেন, "তোর দেখতে যাবার দরকারটা কি ছিল সুধোর মা! যা বারণ করবো কেবল তাই করবি বৈ ত নয়। ফের যদি ও ঘরের দিকে—"

সুধোর মা সেই জন্য আর ও ঘরের দিক দিয়াও অপরাহ্নে হাঁটে নাই।

সন্ধ্যা হইলে দ্বারে ঘা পড়িল। বনমালা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল—গৃহিণী স্বয়ং।

তিনি তেমনি রুক্ষস্বরে বলিলেন, "এমন অলক্ষণও তো কখনও দেখেনি বাছা। ভরা সন্ধ্যেবেলায় গৃহস্থ বাড়ীতে সন্ধ্যে পড়বে না, দোরে একটু গঙ্গাজল পড়বে না, দোরে খিল দিয়ে ঘুমানো, আমি তো এর মানে বুঝিনে। কর্ত্তাকে বলে দিয়েছি, তোমাকে তোমার বাপের কাছে রেখে আসুন গে, সেখান থেকে নিয়ে এসে যা হবার তা বেশ হয়েছে।" বলিয়া অৰ্দ্ধমুক্ত দ্বারটী সশব্দে খুলিয়া ফেলিয়া গৃহকোণে অবস্থিত প্রদীপটী জ্বালিয়া, খানিকটা গঙ্গাজল চৌকাটের উপর ছিটাইয়া দিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন, বনমালা সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

উপেক্ষা ও অপমানের তীব্র আঘাতগুলি যখন তাহার

অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন সুধোর মার একটী কথা হঠাৎ তাহার মনের মধ্যে যেন অগ্নিবিন্দুর মত জ্বলিয়া উঠিল। সকালে সুধোর মা তাহাকে বলিয়াছিল যে তাহাদের ঘরে এরূপ ঘটনা ঘটিলে গলায় কলসী দিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মরিত। সুধোর মা ঘটনাটীর ঠিক কোন অংশটুকুর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া এই কথা বলিতে লাগিল যে ঘটনা যাহাই হউক, এত অপমান ও মর্ম্মান্তিক যাতনার চেয়ে সেই ভাল। তাহার দেহমনের সমস্ত গ্লানি গঙ্গার শীতলজলে বিসর্জ্জন দেওয়া ছাড়া আর অন্যপথ এখন নাই।

জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে যে সামান্য ঘটনার বীজ-টুকুকে আমরা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিই, সময়ের পরিবর্ত্তনে সেই সামান্যর ভিতর দিয়া কেমন করিয়া যে একটা বিরাট অসামান্য ব্যাপার আসিয়া আমাদের চমকিত করিয়া দেয়, তাহা কিছুতেই ভাবিয়া পাই না। যাহার ক্ষুদ্রতাকে একদিন তুচ্ছ করিয়াছিলাম, সেই আবার একদিন তাহার বিরাট মূর্ত্তি লইয়া এমনি ভাবে আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, যে তাহারই সম্মুখে আমাদের উচ্চশির নত হইয়া পড়ে, তাহাকেই আবার বিরাট বলিয়া মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। বৃহৎ বনস্পতিকে দেখিয়া কয়জন মনে করিতে পারে, যে ক্ষুদ্র বীজ-কণার মধ্যে ইহার প্রাণশক্তি নিহিত ছিল, হয়তো তাহাকে নিজের হাতে করিয়াই একদিন বায়ুস্তরে উড়াইয়া দিয়াছি।

কে বুঝিয়াছিল যে স্থখোর মার মুখ দিয়া ক্ষুদ্র সেই কথাটুকু বীজের কণার মত মাটীতে পড়িয়াও কোন এক সুযোগে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে !

কথাটাকে মনের মধ্যে বনমালা বার বার যতই আন্দোলিত করিতে লাগিল, ততই তাহা বিদ্যুতের তীব্রচ্ছটার মত তাহার রক্তের মধ্যে নৃত্য করিয়া তাহাকে যেন একটী কিসের নেশায় রঙিন করিয়া দিল।

যতই সময় যাইতে লাগিল, আত্মহত্যার একটা বলবতী স্পৃহা ততই তাহার মনের ভিতরে ধাকা দিতে লাগিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে রাত্রি হইল, সে তখনও সেই নির্জ্জন ঘরটীর মধ্যে বসিয়া! কেহই তাহার সংবাদ লইতে আসিল না। সারাদিনের উপবাস এবং মনের চাঞ্চল্যে তাহার দুর্ব্বল শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতে লাগিল। একদিনের মধ্যেই কোথাকার ব্যাপারটী কোথায় আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাই ভাবিয়া তাহার মনের ভিতরটী যেন আরও জ্বালা করিতে লাগিল।

সে দিন সন্ধ্যার সময় কেবল যে সেই অভুক্ত রহিল তাহা নহে, বাড়ীশুদ্ধ কাহারও সেদিন আর আহার হইল না। দ্বিপ্রহরে কেবল পীতাম্বর আহার করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, কি একটা কার্য্যের জন্য এ বেলা তিনি আর বাড়ী ফিরিতে

পারিবেন না, বলিয়া দিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর হইতে সুধোর মারও আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নাই।

তাহার শাশুড়ী যে ঘরে শয়ন করিতেন, সে ঘরের প্রদীপ নিবিল, দ্বারের খিলবন্ধ করার শব্দটী বড় বেশী করিয়াই শুনিতে পাওয়া গেল। শাশুড়ী যে অভুক্তাবস্থায় শয্যায় আশ্রয় লইলেন তাহা সে বুঝিল। কিন্তু আজ তাহার বলিবার অধিকারটুকুও লোপ পাইয়াছে!

তাহার মনের কল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিবার যে অদম্য ইচ্ছাটা তাহাকে সন্ধ্যা হইতে ওতপ্রোত চঞ্চল করিতেছিল, সেটা এইবার আবার সাড়া দিয়া উঠিল। সে স্থির করিল, আর নয়, অদৃষ্টে থাকুক আর নাই থাকুক, নিজের এই ঘৃণ্য জীবনটা আজ বড়ই গুরুভার বোধ হইতেছে, আর ইহাকে বহন করিতে পারা যায় না।

বৃদ্ধ পিতার জন্য, মাতার জন্য মনটী বড় কাঁদিয়া উঠিল বটে, কিন্তু কি করিবে উপায় নাই! আজ সে ঈশ্বরের দেওয়া এই জীবনটাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিবে বলিয়া কৃতসংকল্প হইয়াছে।

ঘরের বাহিরে আসিয়া সে চারিদিকে একবার চাহিল। শব্দহীন বাড়ীখানির ঘরগুলি যেন এক একটী প্রেতমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ ভাবে ঘরের দাওয়ায়

দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল যে জীবনের সুখ এবং শান্তি দুই যখন গিয়াছে, মৃত্যুর চেয়ে কাম্য যখন সেই মুহূর্ত্তে তাহার আর কিছু নাই, তখন সে অমন দীনভাবে মরিবে কেন ? বৈধব্যের শুভ্র আবরণ তো লোকালয়ের জন্য, লোকালয়ের পরপারে যে একটা অদৃশ্য রাজ্য রহিয়াছে, তাহার জন্য তো নয় !

ঘরের ভিতরে যাইয়া তাহার ক্ষুদ্র তোরঙ্গটী খুলিয়া বনমালা একখানি লালপেড়ে সাড়ী বাহির করিল, ইচ্ছা হইল যে গায়ে বেশ করিয়া গহনা পরিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লয়, কিন্তু তাহা হইল না, তাহার সমস্ত অলঙ্কারগুলিই তাহার শাশুড়ীর নিকটে রহিয়াছে।

হঠাৎ কি একটা কথা মনে করিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বাক্স হইতে সমস্ত কাপড়-চোপড়গুলি নামাইয়া তলায় যেখানে একখানি খবরের কাগজ পাতা ছিল, সেখানে কাগজে মোড়া কি একটা পদার্থ ছিল, সেটা বাহির করিয়া রাখিল। তারপর ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত বস্ত্রাদি পূর্ব্ববৎ রাখিয়া সেই সাড়ীখান ও সেই কাগজের মোড়কটা আনিয়া আলোর কাছে বসিল।

মোড়কটা খুলিতেই তাহার দুই চক্ষু জলে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। একটা পূর্ব্বস্মৃতি যেটা কিছুকাল হইতে একেবারে চাপা পড়িয়াছিল, সেটা একেবারে তাহার সমস্ত উজ্জ্বলতা ও

নূতনত্ব লইয়া তাহার চক্ষের সমক্ষে আজ ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল।

কাগজে মোড়া যে জিনিষটা ছিল, সেটা একজোড়া সোনার শাঁখা। এইটি তাহার ফুলশয্যার রাত্রে তাহার স্বামী তাহাকে প্রথম প্রণয়োপহার দিয়াছিলেন, তাই সে এটাকে অন্য অলঙ্কারের সঙ্গে না রাখিয়া পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাই মৃত্যুর দুয়ারে পা বাড়াইতে গিয়া তাহার স্বর্গগত দেবতার প্রথম স্নেহোপহার সঙ্গে করিয়া লইতে তাহার মনে বড়ই একটা স্পৃহা জন্মিল। শাঁখা জোড়াটা আলোর কাছে একবার তুলিয়া ধরিয়া দেখিল যে তাহা তেমনি নূতনই রহিয়াছে, তাহার চাক্‌চিক্যের এতটুকুও হ্রাস হয় নাই।

সেই লালপেড়ে শাড়ী পরিয়া, সেই শাঁখা জোড়াটি হাতে দিয়া, সে আবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার ভাবিল সিন্দুরও খানিকটা পরিয়া লয়, কিন্তু সিন্দুরের কৌটাটী তাহার শাশুড়ীর ঘরে থাকিত বলিয়া সে সাধটী আর কার্য্যে পরিণত হইল না।

ধীরে ধীরে সে উঠানে নামিল। নিস্তব্ধ গৃহ কয়খানির দিকে চাহিতেই একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া উঠিল। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া মনের বড় যাতনায় পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইল।

১২

বাবুগঞ্জ হইতে গঙ্গাতীর প্রায় দুই ক্রোশ। বিবাহের পর-বৎসর শাশুড়ী ও অন্যান্য অনেকের সহিত গরুর গাড়ী করিয়া কি একটা যোগ উপলক্ষে একটীবার মাত্র বনমালা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিল, তাহাতে তাহার পক্ষে পথ চিনিবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং একটা রাস্তা দিয়া উন্মাদনার প্রথম শক্তিটা তাহাকে যতখানি পারিল লইয়া গেল, তার পরেই সে ক্লান্ত হইয়া অবসন্নভাবে পথের ধারে একটা মন্দিরের রোয়াকে বসিয়া পড়িল।

সাহসী মেয়ে বলিয়া তাহার শৈশবে একটু খ্যাতি ছিল সত্য, এবং তাহার পিতার সহিত নানা স্থানে ঘুরিয়া ভয় জিনিষটা তাহার মধ্যে ততটা আধিপত্য লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু তবুও এমন দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে তাহার কখনও প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু এ অসমসাহসিক কার্য্যেরও কৈফিয়ৎ তাহার পক্ষে যে ছিল না তাহা নহে। জীবনে এমন দিন কবে কাহার আসিয়া থাকে? তাহার স্বামী তাহাকে ছাড়িয়া লোকান্তরে গিয়াছেন, পিতা তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত আছেন, শ্বশুর শাশুড়ী আজ তাহার অপবাদটাকেই বড় মনে করিয়া সমাজের কাছে মাথা হেঁট করিয়াছেন, সমাজ তাহাকে জগতের মাঝখানে একটা দুরপনেয় কলঙ্কের ছাপ মারিয়া পরিত্যাগ

করিতে উদ্যত। এই বিশ্বের মাঝখানে সে আজ আশ্রয়হীনা অভাগিনী, মনের জ্বালায় আত্মহত্যার প্রবৃত্তির তাড়নায় ছুটিয়া চলিয়াছে। জীবনটাকে যে স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছে, ভূতের ভয়ে অভিভূত হওয়া তার পক্ষে কৌতুকের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়।

তখন খণ্ড মেঘের ভিতর দিয়া চাঁদের আলো দেখা যাইতে-ছিল, এবং সেই পাণ্ডুবর্ণ ক্ষীণ আলোকে দুই দিকের পথের সীমা কালো হইয়া ক্রমে অন্ধকারের স্তরে গিয়া মিশিয়াছে। সম্মুখের খোলা মাঠের মধ্যে মেঘ ও জ্যোৎস্নায় মিলিয়া যেন লুকোচুরি খেলিতেছিল।

বনমালা যখন মন্দিরের চাতালের উপর বসিল, তখন তাহার সর্ব্বশরীর ঝিম ঝিম করিতেছে, হাতে পায়ে যেন খিল লাগিয়া গিয়াছে। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, কিন্তু একবিন্দু জলও নিকটে কোথাও পাইবার উপায় ছিল না।

হায় রে! গঙ্গার গর্ভে যে দেহ বিসর্জ্জন করিতে চলিয়াছে, একবিন্দু জলের অভাবে তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল।

মন্দিরটা বোধ হয় শিবমন্দির, তাহার জালি কাটা দরজার ফাঁক দিয়া ভিতরের দেবমূর্ত্তি সেই স্বচ্ছ চন্দ্রালোকে দেখা যাইতেছিল না, বনমালা কি ভাবিয়া মন্দিরের দ্বারের নিকট আসিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া মন্দিরের

দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। তাহার মন বলিতেছিল,—"ওগো পাষাণের ঠাকুর, এ দুঃখিনীর সকল অপরাধের ক্ষমা করিয়ো! যথার্থই আমি অপরাধিনী কিনা, তোমার তাহা অজ্ঞাত নাই! ওগো অন্তর্য্যামী! আমার অন্তরের দিকে চাহিয়া বলিয়া দাও, ক্ষমা চাহিবার যোগ্যতাও আমার আছে কিনা!" কিন্তু তাহার গলা তখন শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেছে, মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, আঁচলটা বিছাইয়া অবসন্ন ভাবে সেইখানেই শুইয়া পড়িল। মূর্চ্ছিতা হইল কি ঘুমাইয়া পড়িল—তাহা ঠিক বলা যায় না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে এই রাস্তা দিয়া একখানি গরুর গাড়ী ধীর-মন্থর-গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। গাড়ীর ভিতরে এক বৃদ্ধ শয়ন করিয়া নাসিকাধ্বনি করিতেছিলেন, আর গাড়োয়ান গোবর্দ্ধন ঘোষ ঢুলিতে ঢুলিতে, গরু দুইটার পৃষ্ঠে 'পাঁচনের' আঘাত করিয়া, ল্যাজ মলিয়া, রথের সারথিগিরী করিতেছিল। এই মন্দিরটার প্রায় পনের কুড়ি হাত দূরেই রাস্তাটা একটু বাঁকিয়া গিয়াছে, তাহার ওদিকে থাকিতে মন্দিরের সম্মুখভাগ দেখা যায় না।

বাঁকের মুখে গাড়ীখানা ঘুরিবামাত্র হঠাৎ গোবর্দ্ধন মন্দিরের দিকে চাহিয়াই চমকিয়া উঠিল। তাহার চোখে তন্দ্রার যে আবছায়াটুকু আসিতেছিল, সেটা সেই মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিত হইল।

'চুমকুড়ি' দিয়া গরুদুইটীর নাসিকাসংযুক্ত 'রাশ' দুইটা টানিয়া গাড়ী থামাইল, চোখ দুইটা মুছিয়া, সে আবার ভাল করিয়া মন্দিরের রোয়াকের উপর সেই সাদা রংয়ের স্তূপীকৃত বস্তুটী দেখিল। চাঁদের ক্ষীণ আলোতে ভাল করিয়াও কিছু দেখা যাইতেছিল না, অথচ কাছে গিয়া দেখিবার সাহসও হইতেছিল না। গোবর্দ্ধনের বক্ষস্থল ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। সে তখন ছইয়ের ভিতব নিদ্রিত সেই বৃদ্ধটীকে ডাকিল,—"দা'ঠাউর !"

কিন্তু বৃদ্ধের নাসিকাধ্বনি পূর্ব্ববৎ শোনা যাইতে লাগিল।

গোবর্দ্ধন আর একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল,—"ও দা'ঠাউর ! বলি, দা'ঠাউর ! একেবারে ঘুমিয়ে যে সারা গো ! বলি ওগো ও চকোত্তি মশাই !"

চক্রবর্ত্তী পূর্ব্ববৎ।

গোবর্দ্ধন তখন দাদাঠাকুরের গা ঠেলিয়া তাঁহাকে পুনরায় ডাকিল। বৃদ্ধ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া, চোখদুটী রগড়াইয়া বলিলেন,—"কিরে ! অমন ক'রে চেঁচাচ্ছিস্ কেন ষাঁড়ের মত ? অঃ—এই সবে তন্দ্রাটুকু এসেছে, আর বেটা হাকাহাঁকি সুরু ক'রে দিয়েছে। তামাক খেতে হবে বুঝি ! তুই বাপু এবার দেশলাই আর টিকের কৌটোটা তোর কাছে রেখে দে, আমাকে আর জ্বালাতন করিস্‌নে।"

দাদাঠাকুর আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু গোবর্দ্ধন হস্তেঙ্গিতে তাঁহাকে চুপ করিতে বলিয়া বলিল,—"তামাক নয় গো দা'ঠাউর! ঐ দিকে একবার চেয়ে দেখ দিকিনি।"

চক্রবর্ত্তী ছইয়ের বাহিরে মুখ বাড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া কিছুই না দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"কোন দিকে রে? কি হ'য়েছে কি?"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"আরে ঠাউর, ওদিকে না। ওই মন্দিরটার দিকে চাও দিকি। চূড়োর দিকে নয়—রকটার দিকে।"

দাদাঠাকুর দেখিলেন, চোখ দুইটা আর একবার ভাল করিয়া রগড়াইয়া একদৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত্ত দেখিলেন। মন্দিরের রোয়াকের উপর সাদা মতন কি যেন একটা পড়িয়া আছে তাহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইল না। বলিলেন,—"গোবরা!"

"এজে দেবতা।"

"কি বল দেখি?"

"কেমন ক'রে জান্‌বো বল ঠাউর! তুমিও যেখানে আর আমিও সেখানে। ওই দেখেই তো গাড়ী থামিয়েছি। ওর নাম কি, এই রাত্তিরে, রাম—রাম—রাম,—তাই নয় তো ঠাউর মশায়!"

ঠাকুর মশাই একটু চিন্তিতভাবে যেন বলিলেন,—"দূর

হারামজাদা, তিন কুড়ি বছর বয়স হোল, একদিনও এই নন্দ চক্রবর্ত্তীকে কেউ ভূতের ভয় দেখাতে পারে না,—আর এই বুড় বয়সে তুই কিনা বেটা ভেমো গয়লা——দূর,—দূর, আহাম্মুক কোথাকার।"

গোবর্দ্ধন কোন উত্তর না দিয়া একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"গোবরা, লণ্ঠনটা নিয়ে একবার দেখে আস্‌তে পারিস্‌?"

চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া গোবর্দ্ধন বলিল,—"আমি?"

চক্রবর্ত্তী মশায় হাসিয়া বলিলেন,—"তুই যা মরদ, আমি তা বুঝে নিয়েছি। এক কাজ কর, লণ্ঠনটা গাড়ীর তলা থেকে খুলে নে, নিয়ে আয় আমার সঙ্গে। দেখি ওটা কি। আ-মর বেটা, কাঁপছিস্‌ যে! মূর্চ্ছো যাবি নাকি রে বেটা হারামজাদা।"

গোবর্দ্ধন মনের মধ্যে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল,—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, মুচ্ছো অমনি সবাই যায়। আমার ঠাউরদাদা এক ঘা লাঠিতে দুটো বুনো শিয়াল মেরেছিল তা তো জানো গো দা'ঠাউর!" এই বলিয়া গোবর্দ্ধন গাড়ীর তলা হইতে টিনের ফ্রেমে আঁটা, ভেতরে কেরাসিনের ল্যাম্প বসানো লণ্ঠনটী খুলিয়া আনিয়া আবার বলিল,—"চলো দাদাঠাউর! গরু দুটো এখানেই থাক, কি বলো গো!"

চক্রবর্ত্তী মশাই হাসিয়া বলিলেন,—"গরু যে ভগবতী, ওদের

কেউ কখনও কিছু অনিষ্ট কর্ত্তে পারে বোকা!" এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী মশাই অগ্রসর হইলেন। গোবর্দ্ধনও হাতের পাঁচন-গাছটী দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

কাছে গিয়া চক্রবর্ত্তী মশাই দেখিলেন, সেটা অন্ত কিছু নয় মানুষ, তখন এক গাল হাসিয়া বলিলেন,—"এ যে একটী মেয়ে মানুষ দেখছি রে গোবরা!"

গোবর্দ্ধন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"রাম বল দা'ঠাউর! আমি ভেবেলাম অন্ন্যো কিছু, তা কেউ মড়া টড়া ফেলে রেখে যাই নি তো!"

চক্রবর্ত্তী মশাই হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"সাধ ক'রে কি আর তোকে গালাগালি দিই রে! গায়লার বুদ্ধি আর কত হবে! হ্যাঁরে! লোকে মড়া এনে বুঝি তাকে আঁচল বিছিয়ে ঠাকুর-মন্দিরের রোয়াকে শুইয়ে রেখে যায়, এই তো তোর বুদ্ধি। দূর হতভাগা কোথাকার।"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"বল কি ঠাকুর! তবে কি জ্যান্ত নাকি?"

চক্রবর্ত্তী মশাই বলিলেন,—"হাঁ তাই ব'লে তো মনে হয়। এখন তুই একবার চেঁচিয়ে ডাক দিকিনি।"

গোবর্দ্ধন উচ্চরবে ডাকিল,—"ওগো ঠাক্রুণ! মা-ঠাক্রুণ গো! ও মা-ঠাক্রুণ!"

প্রত্যুত্তর তো পাওয়া গেলই না, বনমালার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটুও নড়িল না। তাহা দেখিয়া গোবর্দ্ধন বলিল,—"দা'ঠাকুর! তুমি বিশ্বেস কর আর না কর, আমি বল্‌চি ও ঠিক মড়া! তাই বলেচি এখনও রাম রাম ব'লে চলে এসো। নইলে এই রাত্তিরে বেঘোরে কি—"

কিন্তু চক্রবর্ত্তী মশাই বিশেষ মনোযোগের সহিত সেই শায়িত দেহের দিকে চাহিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনের কথা শুনিয়া, তিনি ধীরে ধীরে চাতালের উপর উঠিয়া বনমালার শায়িত দেহের দিকে অগ্রসর হইলেন। গোবর্দ্ধন তীব্রভাবে নিষেধ করিল, কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া তাহার নাসিকার নিকট নিজের হাতখানি ধরিলেন। তাহার মুখ হঠাৎ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। গোবর্দ্ধনকে বলিলেন,—"গোবরা! শীগ্‌গির গাড়ীর কাছে যা, হুঁকোয় জল পুরবো বলে' সেই বড় ঘটিটায় একঘটি জল যে ছইয়ের বাতায় দড়ি দিয়ে টাঙ্গিয়ে রেখেছিলাম, গাড়ীর ঝাঁকুনিতে বোধ হয় তার সবখানি পড়ে যায়নি। দৌড়ে গিয়ে সেই জলের ঘটিটা নিয়ে আয় দিকি। এ বেঁচে র'য়েছে। আমার বোধ হয় ভিরমি—ভিরমি লেগেছে—যা যা, বেটা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো!"

গোবর্দ্ধন ছুটিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই জলের ঘটিটী লইয়া ফিরিয়া আসিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন ঘটী হইতে

খানিকটা জল লইয়া বনমালার মুখে চোখে বেশ করিয়া ছিটাইয়া দিলেন, খানিকটা জল মাথার উপরে বেশ করিয়া থাবড়াইয়া দিলেন।

নিজের চাদর দিয়া হাওয়া করিয়া এবং মধ্যে একটু করিয়া জলের ঝাপ্‌টা দিয়া কিছুক্ষণ শুশ্রূষা করিবার পর বনমালা চক্ষু মেলিয়াই হঠাৎ সম্মুখে দুইজন অপরিচিত লোক দেখিয়াই কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী মশাই বলিলেন,—“কিছু ভয় ক’রো না মা! আমি তোমার বুড়ো ছেলে! ওঠ মা, উঠে বসো। পারবে তো আস্তে আস্তে বস্‌তে?”

বনমালা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। একটু ঢোক গিলিয়া গলাটা ভিজাইয়া বলিল,—“একটু জল।”

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—“এই যে মা, এই ঘটীতেই খানিকটা আছে, খুব বেশী যদিও নেই, তা এইটুকুই খাও মা। একঘটী এনেছিলাম, গরুর গাড়ীর ঝাঁকুনিতে কতক প’ড়ে গিয়েছে, আর যে টুকু ছিল, তোমার মুখে চোখে মাথায় দিয়েছি।”

বনমালা এক নিঃশ্বাসে জলটুকু পান করিয়া ফেলিল। সারাদিনের উপবাসের পর এইবার যেন সে একটু শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্মুখস্থ দণ্ডায়মান গোবর্দ্ধনকে বলিলেন,

"গোবরা, গাড়ীখানা এইখেনেই নিয়ে আয়। ওখানে আর বনের মধ্যে রেখে কাজ নেই। এই গোবরা তো তোমাকে দেখে বুঝলে মা, ভূত মনে করে আসতেই চায় না। আমিই ব'ল্লাম,—ওরে হ্যাকা, ভূত কখনও আঁচল বিছিয়ে রোয়াকে শুয়ে থাকে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজেই হোঃ—হোঃ—শব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

গোবর্দ্ধন গাড়ী আনিতে চলিয়া গেলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বনমালাকে বলিলেন,—"মা, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, মনে কিছু ক'র্ব্বে না তো!"

বনমালা বলিল,—"না, আপনি বলুন।"

"এই ভয়ঙ্কর রাত্তির, তার ওপর চারিদিকে বন-বাদাড়, এর মধ্যে তোমাকে এখানে এ অবস্থায় দেখছি কেন?"

বনমালা মাথা নীচু করিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"তুমি যে ভদ্রঘরের মেয়ে, তা তুমি না ব'ল্লেও আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি। তা মা, রাগ কোরো না, অবিশ্যি যে কারণেই হোক, যখন বাড়ী থেকে পথে বেরিয়েছ, তখন নিশ্চয় কোথাও যাবে বলেই বেরিয়েছিলে। ভূত প্রেতের ভয় যখন আমি নিজে করিনে, তখন ও ভয়ের কথা তুলতে চাইনে, কিন্তু এই নিশুতি রাত্তিরে—পথে চোর ডাকাতের তো অভাব থাকে না মা! হাতেও আবার কি একটা

চক্‌চক্‌ ক'চ্ছে দেখ্‌তে পাচ্ছি। তা মা, একলাই পথে বেরিয়ে-ছিলে, না আর কেউ সঙ্গে ছিল, ?"

বনমালা এবার অতি ধীরে ধীরে বলিল,—"সঙ্গে আর কেউ ছিল না, আমি একলাই বেরিয়েছি।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"এঁ্যা—সত্যি ব'ল্‌ছো?—একলা বেরিয়েছে?—সঙ্গে কেউ ছিলনা?—খুব বুকের পাটা তো তোমার মা!" এই বলিয়া তিনি মুখটী গম্ভীর করিলেন। তারপর কি একটু ভাবিয়া আবার বলিলেন,—"তা কোথায় যাবে ব'লে মনে ক'রেছিলে?"

বনমালা বৃদ্ধের এই প্রশ্নে যেন একটু চমকিয়া উঠিল। কিন্তু সত্য কথা বলিতেই হইবে। তাই সে বলিল,—"গঙ্গার ঘাটে।"

"গঙ্গার ঘাটে! গঙ্গার ঘাটে এই নিশুতি রাত্তিরে কি দরকার মা?"

বনমালা আর কোন উত্তর না করিয়া নীরবেই বসিয়া রহিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তোকে যখন মা ব'লে ডেকেছি, তখন এই বুড়োর কথাটুকু রাখিস্‌ মা! আমার চোখে ধুলো দিতে যাস্‌ নে। এতখানি বয়সের মধ্যে এই নন্দ চকোত্তি অনেক দেখে—অনেক ঠেকে শিখেছে। রাত দুপুরের সময় তুমি যখন একলাটী গঙ্গার ঘাটে যাচ্ছিলে,

তখন আমি সব বুঝেছি মা!—জলের মত বুঝেছি।" এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় গম্ভীরভাবে বসিলেন।

বনমালা পূর্ব্ববৎ মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিল। কয়েক-মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় আবার বলিলেন,—"যদিও আন্দাজে আমি বুঝে নিয়েছি,—তবু আবার তোকে জিজ্ঞেস্ কচ্ছি, এই মন্দিরের সাম্‌নে ব'সে মিথ্যে কথাটুকু ব'লে যেন আমাকে ভুলাস্ নে মা! আচ্ছা, ঠিক কথা বল দিকি,—কি ক'ত্তে যাচ্ছিলি এই রাত্তিরে গঙ্গার ঘাটে?"

বনমালা কোনও উত্তর দিল না। পূর্ব্ববৎ নীরবেই রহিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"যাক্—আর কোন সন্দেহ নেই।"

এই সময় গোবর্দ্ধন গাড়ীখানিকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাকে বলিলেন,—"গোবরা, বেশ ক'রে এক কল্কে তামাক সাজ।"

গোবর্দ্ধন তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবার বনমালার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মা! একবার মুখখানি তোল দিকিনি।"

বনমালা এতক্ষণে এই বৃদ্ধের দিকে চাহিল। এমন সরল,—এমন প্রাণখোলা কথাবার্ত্তা সে জীবনে কখন কাহারও কাছে শুনে নাই। যে জীবনটা এতদিন তাহার কাছে একাদশী তিথির

মত নীরস ও শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল, এখন এই বৃদ্ধ যেন তাহার জীবনের মধ্যে কি এক অমৃতরস সিঞ্চন করিয়া দিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"বাড়ী ফিরে যাবে না মা ?"

বনমালা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখান থেকে তোমাদের বাড়ী কতদূর হবে ?"

বনমালা বলিল,—"জানিনা।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"জান্‌লেও তো তুমি আমাকে ব'ল্‌বে না, কেমন ?"

বনমালা সে কথার কোন উত্তর দিল না।

হুঁকায় একটা সুখটান দিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় আবার বলিলেন,—"কিন্তু এ অবস্থায় তো তোমাকে এই বনের ভেতর ফেলে রেখে যেতে পারিনে মা! মানুষের মন না মতিভ্রম! আমি চ'লে গেলেই হয়ত তোমার ঘাড়ে আবার ভূত চাপবে। আজ এই যে শিবের মন্দিরের সামনে তোমাকে পেয়েছি, এটাকে আমি ভগবানের দয়া বলে মাথা পেতে নিচ্ছি। কিন্তু তুমি অনুরোধ কল্লেও, এটি জেনো মা,—যে এই বুড়ো চকোত্তী বামুন তোমাকে গঙ্গায় ডুবে মরবার জন্যে এইখানে একলাটি ফেলে রেখে যে গরুর গাড়ীতে চ'ড়ে ঘুমুতে ঘুমুতে যাবে, তা কিছুতেই হবে না।"

বনমালা এইবার মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া এই বৃদ্ধের পদধূলি লইল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বড় সমস্যায় পড়িলেন। এ অবস্থায় ইহাকে ছাড়িয়া যাইতেও পারেন না, অথচ নিজের সঙ্গে লইয়া যাওয়াও যে কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহাও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না।

নিঃশব্দে দুই ছিলিম তামাক পোড়াইয়া শেষে স্থির করিলেন যে ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়াই ভাল, তারপর দুই পাঁচদিন পরে ইহার মন একটু সুস্থির হইলেই নিজে সঙ্গে করিয়া ইহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বনমালাকে বলিলেন,—"আমার সঙ্গে যেতে পার্কে মা! দেখতেই তো পাচ্ছ, বুড়ো মানুষ, বাড়ীতে আমার কেউ নেই, এই গঙ্গাটা পার হ'য়ে আরও প্রায় আড়াই ক্রোশ গেলেই আকন্দপোতা গ্রামখানা। সেইখানেই এ বুড়োর একটু কুঁড়ে আছে, যাবে মা সেইখানে?"

বনমালা এবার কিছুমাত্র সংশয় না করিয়া বলিল,—"যাব।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর বলিলেন, —"হ্যাঁ, সেই ভাল কথা মা! তোমাকে আজ আমি ছেড়ে দেব না বলেছি তো। আজ স্বয়ং মহাদেব তোমায় এই বুড়ো ছেলেটাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তা হ'লে ওঠ

মা, মন্দিরের ঠাকুরকে প্রণাম কর, তাঁর আশীর্ব্বাদ যেন নিত্য তোমার উপর থাকে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ গোবর্দ্ধনকে ডাকিলেন, —"গোবরা! গোবরা রে! ও গোবরা! ওঠ ওঠ, বেটা হারামজাদা ঘুমিয়ে প'ড়েছে দেখ্ছ মা!—একেবারে যেন কুম্ভকর্ণের মত।"

গোবর্দ্ধন গাড়ীর মাচানের উপর শয়ন করিয়া ঝিরঝিরে হাওয়ায় একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ বৃদ্ধের আহ্বানে সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া পড়িল। তখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাকে গাড়ী ঠিক করিবার আদেশ দিলেন।

গোবর্দ্ধন গরু দুইটাকে রাস্তার অপর পার্শ্বস্থ একটা ক্ষুদ্র বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সে দুটীকে খুলিয়া আনিয়া বলিল,— "তা হ'লে উঠে পড়ুন—দা'ঠাউর।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বনমালাকে বলিলেন,—"তবে উঠে পড় মা! এদিকে প্রায় ভোর হ'য়ে এলো,—মিছে আর দেরী ক'রে লাভ তো কোন নেই।"

বনমালা ধীরে ধীরে সেই গাড়ীর ভিতর উঠিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও উঠিলেন। তখন গোবর্দ্ধন বলিল, —"এবার গাড়ী যুড়ে দিই।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"হ্যাঁ দে।"

গোবর্দ্ধন গাড়ী যুড়িয়া দিল, বৃষ-বাহিত ক্ষুদ্র রথ ধীরে ধীরে সেই গ্রাম্য পথের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

১৩

বাড়ীর দ্বারে পৌছিয়া বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বনমালাকে বলিলেন,—"এইটুকু আমার কুঁড়ে। এইখানে আমি একলাই থাকি, রান্নাবান্না করি,—ঠাকুর পূজো করি, আর ফুরসৎ পেলে একটু আধটু ভগবানের নামও ক'রে থাকি। এসো মা! কোন সঙ্কোচ,—কোন লজ্জা ক'রো না, নিজের বাড়ী মনে ক'রে আজকের মত থাক, তারপর কাল যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।" এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার পৈতায় বাঁধা চাবি কাটিটী খুলিয়া দ্বারের তালা খুলিলেন।

বনমালা গাড়ী হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কাল কি ব্যবস্থা ক'র্ব্বেন বাবা?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"ব্যবস্থা অনেক আছে রে পাগলী!—ব্যবস্থা অনেক আছে। সে সব কথা পরে বল্‌বোখন। আপাততঃ তোকে দুটী না খাইয়ে আর কোন কথা নয়। কাল রাত্তিরে যে কিছুই খাস্‌নি, সে কথা অস্বীকার কল্লে আমি বিশ্বাস কর্ব্বো না"

বনমালা ঈষৎ হাসিল। কেবল কাল রাত্রে নয়, কাল সমস্ত দিনটার মধ্যেও যে একবিন্দু জলও তাহার উদরে যায়

নাই, সে কথাটা আর বলিয়া এই সরলপ্রাণ বৃদ্ধটীকে আরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"তুমি তো বামুনের মেয়ে মা ?"

বনমালা ধীরে ধীরে বলিল,—"না, কায়স্থের।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"তা হোক, কিছু দেরী হবে না না! এখনও পাঁচখানা গাঁয়ের লোক জানে যে, নন্দ চক্কোত্তি না হ'লে কোন জায়গার যজ্ঞির রান্না হবে না। ঘরের কানাচে পাতকুয়ো, সেখানে বাল্‌তী দড়া সবই আছে,—তুমি মাথায় একটু জল দিয়ে নিতে নিতেই দেখ্‌বে সব প্রস্তুত।"

বনমালা বলিল,—"কেন বাবা, আমার জন্যে এত কষ্ট ক'র্‌বেন ?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় হোঃ—হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, —"শোন কথা! রাঁধতে গিয়ে নন্দ চক্কোত্তীর কষ্ট! তোরা কি ভাবিস্ রে পাগলী—যে রান্না জিনিষটে মেয়ে মানুষেরই একচেটে! অবিশ্যি নিজের মুখে অহঙ্কার করাটা শোভা পায় না, কিন্তু যাও নেয়ে এসো, তারপর নিজেই বুঝবে যে এই পাগলা বুড়োটার শুধু দেমাক নয়, যা কথায় বলে, কাজেও তাই করে।"

আহারাদির পর তামাক খাইতে খাইতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"দেখ মা, তোকে পথ থেকে কুড়িয়ে এ া, কেমন

যে তোর ওপর একটা মায়া ব'সে গিয়েছে তা ব'ল্‌তে পারি নে। আমারও এককালে সবই ছিল মা! এই যে ভাঙা ঘর দু'খানা দেখ্‌ছিস,—এ এমন শশ্মানে পরিণত ছিল না। তা মা! সব-ই বিসর্জ্জন দিয়ে কেবল নিজে অখণ্ড পিরমাই নিয়ে ব'সে আছি।" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হুঁকার ডাক হঠাৎ বন্ধ হইয়া উঠিল, পূর্ব্বেকার স্মৃতিগুলি যেন বড়ই উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার মনে একটা ঘা দিল।

কয়েকমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া, বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন, —"মায়া যতই হোক না কেন মা, তোকে তো আর চিরকাল ধ'রে রাখতে পার্ব্বো না! অবিশ্যি আসল ঘটনাটা না জানলেও এটা জেনেছি—যে খুব মর্ম্মান্তিক কষ্ট না পেলে, তুই আর অত রাত্তিরে বাড়ী ছেড়ে বেরুতিস না। বাপের বাড়ীই হোক আর শ্বশুর বাড়ীই হোক, এই দুটোর মধ্যে যে কোন একটা জায়গা হবেই হবে। কিন্তু মা, এই দুটোর মধ্যে আবার একটা কথা আছে। একটা রক্তের বন্ধন—আর অপরটা ধর্ম্মের বাঁধন, এই দুটোর মধ্যে তো কোনটাকেই উড়িয়ে দেবার যো নেই মা! মনের ভুলে না বুঝতে পেরে যে কাজটি ক'রে ফেলেছ, সেটার প্রায়শ্চিত্ত তো ভোগ ক'ত্তেই হবে। বিশেষতঃ আমাদের হিন্দু-সমাজে মেয়ে মানুষের প্রায়শ্চিত্ত বড় ভয়ঙ্কর। তা যখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছো, তখন প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েই গিয়েছে। এখন

জিজ্ঞেস ক'রি মা! যেখান থেকে আসছে সেটা তোমার বাপের না শ্বশুর বাড়ী?"

বনমালা বলিল,—শ্বশুর বাড়ী।"

বৃদ্ধ কয়েকমুহূর্ত্ত কি ভাবিলেন। তারপর বলিলেন—"অতি হাল্কা ভেবে যে কাজটা ক'রে ফেলেছ মা, সেটা একটা ভয়ানক গুরুতর কাজ। এ অবস্থায় এখনই যদি আবার শ্বশুর বাড়ীতে ফিরে যাও, তাহ'লে অবশ্য ভেতরের কথা আমি ছাড়া কেউ জানবে না, কিন্তু সে যাই হোক, এখন সেখানে ফিরে গেলে তোমার শ্বশুর শাশুড়ী বা স্বামী, এঁরা কেউই তোমার ওপর—"

বনমালা বাধা দিয়া একটু শক্তভাবে বলিল,—"স্বামী নেই।"

কথাটির প্রকৃত অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"তিনি বুঝি অন্য জায়গায় থাকেন?"

বনমালা বেশ শান্তভাবে বলিল,—"না, আমি বিধবা।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় চমকাইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনের কপাটে যেন একটী ঘা পড়িল, বনমালার পরণের লালপেড়ে সাড়ীখানির দিকে, তাহার মণিবন্ধের সোণার শাঁখা জোড়াটীর দিকে কয়েক-মুহূর্ত্ত নির্ব্বাকভাবে তাকাইয়া বলিলেন,—"তাহ'লে কি আমারই বোঝবার ভুল হ'য়েছে মা! তোমার হাতে শাঁখা, পরণে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী, কিছু মনে করো না মা! গেরস্তর ঘরের

বিধবা ঝি বৌয়া তো এসব—" বৃদ্ধের কথা আর সম্পূর্ণ হইল না, মাঝখানেই আটকাইয়া গেল।

বনমালা বলিল,—"এই যে শাঁখা জোড়াটা দেখছেন বাবা, এটা তাঁরই দেওয়া প্রথম উপহার। তাই এটা তাঁরই নাম ক'রে পরিচি।" বলিয়াই সে নিজের পরিহিত বস্ত্রখানির প্রতি চাহিল। সেটার সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ ছিল না।

কিন্তু বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তীর চক্ষু দুইটী যেন আনন্দে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল,—"সত্যি সত্যিই তুমি সাধ্বী মা! আজ যদি ব্রাহ্মণ কায়স্থের প্রভেদ না থাক্‌তো, তাহ'লে তোমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হ'লেও তোমাকে আমি প্রণাম কর্ত্তাম।"

বনমালার মুখখানি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"তাহ'লে তোমার বাপের বাড়ী একখানা চিঠি লিখে—সেখানে কে আছেন মা?"

পিতামাতার জন্য বনমালার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছিল, সে পিতার নাম ও তাঁহার ঠিকানা বলিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"বেশ, তাহ'লে তাঁকে একখানা চিঠি লিখে দিই। যে কটাদিন তাঁর কাছ থেকে কোন উত্তর না আসে, সে কটাদিনের জন্যে বুঝলে মা,—আবার পাড়াগাঁয়ের লোকেদের মনের কথা তো আর বলা যায় না, কাজ কি আবার

একটা নূতন হাঙ্গামা বাঁধিয়ে, তার চেয়ে আমি বলছিলাম কি যে, এই কটাদিনের জন্যে, এই যে পাশের বাড়ীটা দেখছো, ওটা হ'চ্ছে শ্রীরাম ঘোষের বাড়ী। শ্রীরাম অনেকদিন গত হ'য়েছেন, তাঁর মেয়ে এখন তারই ছেলে পুলে নিয়ে ওখানে আছেন। আমার বাড়ীতে তো কোন মেয়ে ছেলে পিলে নেই, কাজেই একটু কষ্ট হ'লেও ওই বাড়ীতেই আমি সব ব্যবস্থা করিয়ে দিচ্ছি। ওখানে তোমার সঙ্গীও পাবে অনেক, শ্রীরামের মেয়ে পুঁটুরাণী, তার ভাল নাম হ'চ্ছে গিয়ে বুঝি লাবণ্যলতা না কি, সে তোমার চেয়ে বোধ হয় দু'চার বছরের ছোট হ'তে পারে, কিন্তু বড় লক্ষ্মী মেয়ে, তার সঙ্গে তোমার একদিনেই খুব ভাব হ'য়ে যাবে।"

বৃদ্ধের এই সব অসংলগ্ন কথাগুলি শুনিয়া বনমালা বলিল,—"কেন বাবা, আমাকে কি তাড়িয়ে দিচ্ছেন? এখানে তো আমার একটু মাথা গুঁজে প'ড়ে থাকবার কিছু অসুবিধে হবে না।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"তোমাকে তাড়িয়ে দেব আমি, কি ব'লছো মা! বলি এখনও এই বুড়োকে চিনতে পারলে না। তোমার কি আমার সুবিধে অসুবিধের কথা তো গাঁয়ের লোক বুঝবে না। আমার এই শূন্য পুরীর মধ্যে তোমাকে এনে রেখেছি এই কথাটুকু রাষ্ট্র হ'লে যে তার নানা ডালপালা বেরিয়ে যাবে।"

বনমালা বলিল,—"সেকথা আমি বলছি নে। আচ্ছা, আপনি যেখানে আমাকে থাকতে ব'লবেন, আমি সেইখানেই থাকবো।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"এই যে পাশের বাড়ীটায় মা! এই রান্নাঘর থেকে আমি মা ব'লে ডাকবো, আর তুমি পাঁচিল-টার ওপাশ থেকে সাড়া দেবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিলেন।

বনমালাও হাসিয়া উঠিল। এই বৃদ্ধের স্বভাব কোমল কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া স্নেহ ও আন্তরিকতার এমন একটা মধুর ধারা প্রবাহিত হইতেছিল, যে, বনমালা তাঁহার চরণে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—"হ্যাঁ বাবা তাই হবে।"

১৪

দীর্ঘকালের পরে পিত্রালয়ে আসিয়া গ্রামের অবস্থা দেখিয়া হরিমোহিনী অবাক হইয়া গেলেন। যাহারা ছোট ছিল তাহারা বড় হইয়াছে, তখন যাহারা কর্ত্তা ছিলেন, এখন তাঁহারা স্বর্গারূঢ়, তাঁহাদের স্থানে আজ তাঁহাদের বংশধরেরা প্রভুত্ব করিতেছে। যেখানে লোকালয় ছিল, সেখানে বন হইয়াছে, যেথা মাঠ ছিল, সেখানে কাহারও ঘর উঠিয়াছে। দশ বৎসরের ব্যবধানটা নিতান্ত উড়াইয়া দিবার জিনিষ নয়।

রাজলক্ষ্মীকে বলিলেন,—"ভাই বেগুনফুল! গাঁয়ের এমন

অবস্থা হয়েছে তা জানলে আমি কোন্‌কালে এসে তোমাদের নিয়ে যেতাম। এবার যখন এসেছি তখন কেবল যে তোমার মেয়েটীকেই নিয়ে যাব তা মনে করো না, সেই সঙ্গে তোমারও যেতে হবে তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।"

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার বাড়-বাড়ান্ত হোক ভাই বেগুনফুল! মা-লক্ষ্মী তোমার ঘরে অচলা থাকুন, কেবল পুঁটুরাণীকেই তোমার পায়ে একটু স্থান দিও। আমি এই বয়সে আর কোথাও নড়তে চাইনে ভাই, যে কটা দিন বাঁচি, শ্বশুরের এই ভিটেটায় সন্ধ্যে দিয়ে যেন মরতে পারি।"

হরিমোহিনী বলিলেন,—"আচ্ছা ভাই বেগুনফুল, ওটী তো তোমার পুঁটুরাণী, কিন্তু ওর সঙ্গে ওই যে ফর্সা পানা মেয়েটী, সাদা কাপড় পরা, ওটী কাদের মেয়ে তা তো বুঝতে পাচ্ছিনে। ওপাড়ার ঘোষালদের—"

রাজলক্ষ্মী বলিলেন,—"ওটী এ গাঁয়ের মেয়ে নয় ভাই, ওর বাড়ী এদেশে নয়। সে অনেক কথার কথা। শুনো এখন বরং সন্ধ্যেবেলা, চক্কোত্তী মশাই এলে। তিনিই নাকি ওকে পথের ধারে কুড়িয়ে পেয়েছেন।"

"কুড়িয়ে পেয়েছে?" হরিমোহিনীর কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিল। বলিলেন,—"কুড়িয়ে কি রকম? পথের ধারে মানুষ কুড়িয়ে পাওয়া যায় তা তো কখনও শুনিনি।" বলিয়াই

বনমালাকে ডাকিলেন,—"এদিকে একবার এসো তো মা, আমার কাছে।"

বনমালা আসিয়া হরিমোহিনীর পায়ের কাছে একটা ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। এই অপরিচিতা বর্ষীয়সী রমণীর মুখের ভিতর সে যে কি দেখিতে পাইল তাহা বলা যায় না, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই যেন তাহার সমস্ত হৃদয়খানি ইহার চরণ-প্রান্তে আনত হইয়া পড়িল।

হরিমোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নামটি কি মা?"

বনমালা নিজের নাম বলিল।

কি সূত্রে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত তাহার পরিচয় হইল, হরিমোহিনী তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বনমালা তাহাতে কোন উত্তরই দিল না।

কিন্তু সন্ধ্যাকালে চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ডাকাইয়া হরিমোহিনী এই বালিকাটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় যতটুকু জানিতেন তাহা বলিলেন। জানিয়া হরিমোহিনীর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওর বাপকে চিঠি লিখে দিয়েছেন?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"দিয়েছি বই কি মা! সেই দিনই চিঠি লিখে দিয়েছি। আসল কাজ এ বুড়ো বামুন কখনও ভোলে না মা!"

"কোন উত্তর পান নি?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"আজই! সেই পশ্চিম মুল্লুকে কতদিনে চিঠি যাবে তারপর তার উত্তর আসবে। অন্ততঃ পাঁচ সাতদিন দেরী হবে বৈ কি।"

হরিমোহিনী বলিলেন,—"তা হবে। কিন্তু যদি ওর বাপও ওকে ত্যাগ করেন?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"শুধু শুধু কি অমনি ত্যাগ ক'র্‌লেই হোল মা! শ্বশুর বাড়ীতে বরং সে কথা উঠতে পারে। কিন্তু বাপ মার মনে কি সে সব কথা উঠতে পারে! সে যে রক্তের টান।"

হরিমোহিনী কয়েকমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সমাজতো সে কথা শুনবে না ঠাকুর মশাই। তার শাসনের নীচে যে সবাইকে মাথা পেতে দাঁড়াতে হবে। আচ্ছা, চক্রবর্ত্তী মশাই, ওর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে একবার খবরটা নিয়ে এলে হয় না! আসলে ঘটনাটা কি তাও জানা দরকার। ভদ্রলোকের মেয়ে, গেরস্ত ঘরের মেয়ে, তাতে আবার বিধবা, রাত্তিরে একলা পথের ধারে পড়ে ছিল বলছেন, কাজেই একবার খবরটা নেওয়া কি উচিত নয়? তাঁরা যদি আবার থানা পুলিশ কিছু করে থাকেন তাহলে কাজটা যে—"

চক্রবর্ত্তী চমকাইয়া উঠিলেন। একবার একটী চুরি মোক-

জমায় সাক্ষ্য দিতে গিয়া তাঁহাকে যে কিরূপ বিব্রত হইতে হইয়াছিল, সে স্মৃতি এখনও তাহার মনে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। সেই অবধি তিনি পুলিশকে যমের চেয়েও ভয় করিতেন। হরিমোহিনীর কথা শুনিয়া বলিলেন, "তাই তো মা, ও কথাটা তো আমার মনেই হয় নি। সত্যি কথাই তো বলেছ তুমি। একেই বলে আমাদের পাড়াগেঁয়ে বুদ্ধি। ভাগ্যিস্ তুমি এসেছিলে মা, এখন তা হলে উপায়? একবার কি সেখানে যাব তাহ'লে! তা তুমি যদি বল তাহ'লে কাল ভোরবেলাই বেরিয়ে আমি দুপুরের মধ্যে ফিরে আসতে পারি।"

হরিমোহিনী বলিলেন, "আমার বিবেচনায় সেইটে করাই আগে দরকার।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "বুড়ো হাবড়ার ঘটে কি আর সব সময়ে বুদ্ধি থাকে মা। এই বুড়ো বয়সে যদি আবার পুলিশের পাল্লায় পড়তে হোত, তাহলে আর--"বলিতে বলিতে বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্নে বাবুগঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় হরিমোহিনীকে বলিলেন, "ঘুরে এলাম মা। ওঁর শ্বশুর পীতাম্বর বাবু, তিনি তো লোক মন্দ বলে বোধ হোল না! আমাকে ব্রাহ্মণ দেখে আমার দুই পা জড়িয়ে বুড়ো বল্লে, ঠাকুর মশাই, আমার ছেলে তো গিয়েছেই, কিন্তু একি হোল, আমার যে আজ জাত মান গেল।"

হরিমোহিনী বলিলেন, "তারপর ?"

"আমি বল্লাম যে মাঠাকরুণটী তো আমার সে রকম নয়, এই ২।৩ দিনেই আমি তাঁকে চিনে নিয়েছি বসু মশায়। ষাট বাষট্টি বছর বয়স হোল, এর মধ্যে এই নন্দ চক্রবর্ত্তী অনেক মানুষ দেখেছে, কিন্তু আমি পৈতে ছুয়ে শপথ কর্ত্তে পারি যে আপনার বৌমাটীর প্রবৃত্তি সে রকম নয়।"

"পীতাম্বর বোস বল্লে যে আমিও কি তা বুঝিনে ঠাকুর। কিন্তু লোকের মুখ চাপা দেব কি করে।"

"আমি বল্লাম, "হয়েছিল কি ?" বোসজা যা বল্লে সে তো কিছুই নয়। কে একটা ডাক্তার এসেছিল গাঁয়ে সেই নাকি ওর হাত ধরে টেনেছিল, মেয়েটীর তখন জ্বর। তারপর—"

হরিমোহিনী বাধা দিয়া বলিলেন, "এইতেই এত ?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "আমিও তো তাই অবাক হয়ে গিয়েছি মা। এ কি! কিছুই নয় বল্লেই হয়, তারই ফলে, ভেবে দেখ দিকিনি মা, আমি যদি মেয়েটীকে না দেখতে পেতাম, তা হলে কি কাণ্ডটা হোত একবার ভাব দিকি ?"

হরিমোহিনী বলিলেন, "তারপর, শেষ কথাটা কি হোল শুনি ?"

"শেষ কথা আর কি। বোস মশাই বল্লেন, এমনিই তো সমাজে নানা কথা উঠছে, তার ওপর আবার যদি তাকে ঘরে

ফিরিয়ে নিয়ে আসি, তা হলে তো গ্রাম থেকে বসৎ ওঠাতে হয়। তার চেয়ে তাকে তার বাপের কাছেই পাঠিয়ে দিন, যা খরচ লাগে আমি বরং দিয়ে দিচ্ছি, সেইখানেই সে থাক, আমরা মনে করবো, যে আমার ছেলের সঙ্গে সঙ্গে সেও মরে গিয়েছে।"

"আমি বল্লাম, "খরচের জন্তে তো আর কিছু আটকাবে না বোস মশাই, কিন্তু কাজটা কি ভাল হবে?" তিনি বল্লেন, "তা ছাড়া আর আমার কি উপায় বলুন।" উপায় আর আমি কি বলবো, 'তাই করবো' বলে আস্তে আস্তে ফিরে এলাম।"

চক্রবর্ত্তী থামিলেন। হরিমোহিনী চুপ করিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন, "এখন কি করবেন ভাবছেন? ওর বাপও যদি ওই রকম কিছু বলে!"

এইখানে হরিমোহিনীর সহিত চক্রবর্ত্তীর মতের মিল ছিল না। চক্রবর্ত্তী বলিতেন, সামাজিক বন্ধন যত বড়ই হোক, রক্তের টান তার চেয়ে অনেক বেশী। হরিমোহিনী প্রত্যুত্তরে বলিতেন যে অন্ত সমাজে সেটা সম্পূর্ণ সম্ভব এবং অস্বাভাবিক, কিন্তু হিন্দু সমাজে তাহা হইবার যো নাই। হিন্দুর সমাজ তাহাকে এমনিই আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে সে বাঁধনের বাহিরে এতটুকুও অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছিল, সুতরাং চক্রবর্ত্তী এক মিনিটকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তা হলে ভাবনার

কথা বৈ কি। শ্রীরামের বাড়ীতে তার মেয়ে কি বরাবর ওকে রাখতে চাইবে?

হরিমোহিনী হাসিয়া বলিলেন, "বেগুনফুল অবিশ্যি মুখ ফুটে কিছু বলতে পারবে না, কিন্তু ওর সংসারের অবস্থাটা দেখতে হবে তো। ওর নিজের মেয়েটীকেই আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছে।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "হ্যাঁ, তা আমি জানি। তোমাকে যে চিঠি লেখা হয়, সে তো আমিই লিখে দিয়াছিলাম।"

হরিমোহিনী তখন বলিলেন, "আচ্ছা, ও মেয়েটীকেও যদি আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাই?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইল। বলিলেন, "সত্যি বলছো মা? আঃ আজ এই বুড়োকে দুর্ভাবনার হাত থেকে বাঁচালে। বাবুগঞ্জ থেকে আসবার পথে এ সমস্যাটী আমারও মনে তোলাপাড়া কচ্ছিল। মনে মনে বল্লাম, "ঠাকুর! বুড়ো বয়সে এ আবার কি বন্ধনে ফেল্লে।" বাঁচালে মা তোমার মুখ দিয়ে আমার ঠাকুরই এ কথা বলিয়েছেন। তিনিই বন্ধন জড়িয়েছিলেন, তিনিই আবার সেই বাঁধন থেকে মুক্ত করলেন।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল, দুই কর যোড় করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া তাঁহার সেই অদৃশ্য ইষ্ট-দেবতার উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম করিলেন।

হঠাৎ আর একটী কথা চক্রবর্ত্তীর মনে হইল। তিনি বলিলেন, "শুনেছিলাম তুমি তো বেশী দিন এখানে থাকতে পারবে না মা। তা হলে কি হবে?"

হরিমোহিনী বলিলেন, "তার জন্যে আর অসুবিধেটা কি হবে? আমি যেদিন যাব সেইদিনই বেগুনফুলের মেয়েকে আর একে দুজনকেই সঙ্গে করে—"

"কিন্তু তুমি নিয়ে যাওয়ার পর যদি ওর বাবার কাছ থেকে চিঠি আসে। তা হলে কি হবে মা?

হরিমোহিনী হাসিয়া বলিলেন, "বুঝতে পেরেছি চক্কোত্তি মশাই, মেয়েটীকে ছেড়ে দিতে আপনার মন কেমন কচ্ছে! কিন্তু ওর বাপ নিতে এলে তখন তো আর আপত্তি করবার কোন পথ থাকবে না।"

বৃদ্ধের স্নেহপ্রবণ হৃদয় একবার ছাপাইয়া উঠিল, চোখ দুইটী বড় বেশী রকম ভিজিয়া উঠিল। কোঁচার খুঁটে চক্ষু দুইটী মুছিয়া বলিলেন, "কথাটা তুমি মিথ্যে বলনি না। মায়া তো নয়,—মহামায়া। কিন্তু আমি যে কথাটী তোমাকে বলছিলাম—"

হরিমোহিনী বলিলেন, "ওর বাপের খবর পেলেই আপনি আমাকে চিঠি লিখে জানাবেন, না হয় একদিন কুঁড়েয় গিয়ে একটু পায়ের ধূলো দিয়ে আসবেন, আমি মেয়েটীকে মোক্তার পুর থেকেই পাঠিয়ে দেব।

চক্রবর্ত্তীর আর আপত্তি করিবার কিছু রহিল না। তিনি বলিলেন, "তা হলেই খাসা হবে মা।

অনেক দিনের পর বৃদ্ধের মনে তাঁহার সাজানো সংসারটীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতিগুলিও এক একটী তীক্ষ্ণ কাঁটার মত সেই রাত্রে তাঁহাকে বিঁধিতে লাগিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে রাত্রিতে বৃদ্ধ একটুও ঘুমাইতে পারিলেন না।

১৩

এগার মাইল রাস্তা হাঁটিয়া রাধানাথ যখন কাটোয়ার রেলষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল, তখন বেলা প্রায় নয়টা।

রাত্রির অন্ধকারে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে তাহাকে নিতান্ত অল্প বেগ পাইতে হয় নাই। একে তো অজ্ঞাত পল্লী-পথের এতখানি দৈর্ঘ্যই তাহার মত অপরিচিত পথিকের পক্ষে যথেষ্ঠ কষ্টদায়ক, তার উপর আবার পূর্ব্বরাত্রে বৃষ্টি হইয়া এই দীর্ঘ পথটীকে পিচ্ছিলও করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়া, এবং খানিকটা ভুল পথে অগ্রসর হইয়া সে যখন ষ্টেশনে আসিল তখন তাহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু দুইটী একেবারে কোটরের ভিতর বসিয়া গিয়াছে, মাথার চুলগুলি অবিন্যস্ত, পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা লাগিয়া পরিধেয় বস্ত্রখানিরও স্থানে স্থানে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে, এবং গায়ের কোটটী ঘামে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে।

কিন্তু এতটা কষ্ট সহ্য করিয়া আসিয়াও সে যখন শুনিল যে ভোরের ট্রেণখানি ঠিক ভোরেই রওনা হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার পরেই বেলা আটটার সময় যে প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানি ছাড়িয়া থাকে, সেখানিও এইমাত্র পরবর্ত্তী ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া গেল, তখন তাহার মনের ভাব যাহা হইল তাহা বর্ণনার অতীত।

ষ্টেশনের দেওয়ালে টাঙ্গানো বৃহৎ কাগজের টাইমটেবেল দেখিয়া সে বুঝিল যে কলিকাতায় যাইবার পরবর্ত্তী ট্রেণ বেলা প্রায় একটার সময় কাটোয়া ছাড়িবে। সুতরাং ধীরেধীরে বাহিরে আসিয়া, যাত্রীদের অপেক্ষা করিবার জন্য করগেটের যে বৃহৎ মণ্ডপটী ছিল, তাহারই চাতালে দাঁড়াইয়া এই দীর্ঘ সময়টার মধ্যে সে যে কি করিবে তাহা অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না।

ষ্টেশনের নিকটে অন্য কোন লোকালয় ছিল না, কেবল অদূরে হাতী মার্কা কেরাসিন তৈলের একটা ডিপো ছিল, রাধানাথ সেখান হইতে তাহার টিনের দেওয়ালে আলকাতরা দিয়া অঙ্কিত বৃহৎ হস্তীর চিত্রটি এবং তাহার উপরে ও নীচে বৃহদক্ষরে লিখিত ডিপোর মালিকের নাম দেখিয়া, ধীরে ধীরে সেই দিকেই অগ্রসর হইল।

ডিপোটীর রক্ষক ছিল এক হিন্দুস্থানী দরোয়ান, সে এই নবাগত বাবুজীকে বোধ হয় তৈলের খরিদদার বা দালাল

ভাবিয়া বেশ খাতির করিয়া বসাইল, এবং জানাইল যে বাবুজী যদি স্নান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহার ব্যবস্থা সে এখনিই করিয়া দিতে পারে। গঙ্গা যদিও অনেকটা দূর বটে, কিন্তু অদূরে ঐ যে লাল রংয়ের কুঠীটি দেখা যাইতেছে, উহা স্থানীয় ডাক-ঘর, ওখানকার ইঁদারার জল কেবলমাত্র চারিটী পয়সার সুখা খাইতে দিলে তাহার এক বালক অনুচর আনিয়া দিবে।

এই প্রস্তাবে রাধানাথ সাগ্রহে সম্মতি দিল। এবং দরোয়ান-জীর এক তৈলসিক্ত গামছা লইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সেই ইঁদারা হইতে আনীত জল এক বালতী মাথায় ঢালিয়া কোনরূপে স্নান কার্য্যটা সমাধা করিয়া লইল। তার পর একটু বিশ্রাম করিয়া, দরোয়ানজীর 'সুখা' সেবনের জন্য আরও গোটাকয়েক পয়সা খয়রাত করিয়া ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু এই কার্য্যটীর ফল নিতান্ত উপেক্ষণীয় হইল না। পূর্ব্ব-রাত্রে তাহার মনের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে, তার উপর এই দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ইঁদারার জল মাথায় দিয়া স্নান করিবার ফলে ট্রেনের মধ্যেই তাহার জরভাব বোধ হইতে লাগিল এবং সন্ধ্যার সময় ট্রেণখানি যখন হাবড়ায় পৌছিল তখন প্রবল জ্বরে সে কাঁপিতেছিল।

একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া কোন রকমে সে তাহার পূর্ব্বেকার মেসের বাসায় আসিয়া সেই রাত্রেই শয্যাগত হইয়া পড়িল।

সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে তাহার প্রায় ১০।১২ দিন লাগিল। এই কয়টী দিনেই তাহার শরীরের এতখানি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছিল যে তাহার সেই শীর্ণমূর্ত্তি দেখিয়া হঠাৎ তাহাকে চিনিতে পারা যাইত না। অন্ন পথ্য করিয়াই, মেসের বাবুদের নিষেধ স্বত্বেও সে মোক্তারপুর রওনা হইল।

* * *

অনেক দিনের পর হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে রাধানাথকে দেখিয়া বিনোদ চৌধুরী অবাক হইয়া গেলেন। তাহার হাত দুটী ধরিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "বাবা, বকাবকি করি, আর যাই করি, এটী মনে মনে নিশ্চয়ই বুঝে রেখ যে সে সব তোমারই ভালর জন্যে করি। আমি বুড়ো মানুষ, আমার তিনকালেরও বেশী কেটে গিয়েছে, এখন কাউয়ে বেঁচে রইছি বললেই হয়, আমার তোমরা ছাড়া আর আপনার বলতে কে আছে বাপু? দাদার একটী মাত্র ছেলে তুমি, তোমার কাছ থেকে আমরা অনেক আশা কর্ত্তাম, কাজেই তোমার বেচাল দেখতে পেলে দুটো কড়া কথা শোনাতে হয় বৈকি। তা বাবা, রাগ করো না, তোমাকে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার মত এমন তো কিছু বলেছি বলে আমার মনে হয় না।"

রাধানাথ নীরবে কথাগুলি শুনিয়া গেল। আজ এই বৃদ্ধের ব্যবহার দেখিয়া সেও হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। এই খানেই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ভয় ছিল, কিন্তু নিজের অনুমানটাকে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া তাহার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বিনোদ চৌধুরীর কথা শেষ হইলে রাধানাথ তাঁহার পায়ে নত হইয়া প্রণাম করিয়া নিরীহ ভাল মানুষটীর মত বলিল, "আপনি যদি আমাকে মার্জ্জনা করেন জ্যেঠা মশাই, তা হলে আমার মনে আর এতটুকু ক্ষোভ থাকে না। নিজে যে কতখানি নেমে গিয়েছিলাম, সেটা যে মুহূর্ত্তে বুঝতে পেরেছি, সে মুহূর্ত্তেই বাড়ী ছুটে এসেছি, কিন্তু আমার মনে বড়ই ভয় ছিল যে আপনি হয়তো আমাকে ক্ষমা করবেন না।"

বিনোদবিহারী হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এত দিন পরে যে তোমার সুবুদ্ধিটুকু ভগবান দিয়েছেন, এইটুকু আমার শান্তি।"

ত্রৈলক্য মিত্রের ঋণের কথা উল্লেখ করিয়া বিনোদ বিহারী জানাইলেন যে তাঁহাকে সুদ শুদ্ধ সমুদয় টাকা মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং সেজন্য কোন চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই।

এতদিন সে অজ্ঞাতভাবে কোথায় ছিল, বিনোদ চৌধুরী তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কথাটাকে হঠাৎ চাপা দিয়া সে বলিল, "যাই, জেঠাই মাকে প্রণামটা করে আসি।"

হরিমোহিনী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বোস দিকিনি, রাধানাথ আমার সামনে।"

রাধানাথ বসিল। যে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য সে তাহার জ্যেষ্ঠতাতের নিকট হইতে কোনরূপে পলাইয়া আসিল, এখানেও আবার সেই প্রসঙ্গটাই তাহাকে নির্দ্দয় ভাবে আক্রমণ করিল, এবার তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা করাও তাহার পক্ষে নিতান্ত সহজ হইল না।

হরিমোহিনী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিন কোথায় ছিলি রে রাধু? একি চেহারা হয়ে গিয়েছে তোর?"

চেহারা সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ তাহার ছিল, সুতরাং কলিকাতায় আসিয়া দশদিন জরভোগ করিয়া সে যে মাত্র পূর্ব্ব দিনে অন্ন পথ্য করিয়াই এখানে আসিয়াছে তাহা বলিল।

• হরিমোহিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিন কোথায় ছিলি?"

উত্তরটা হঠাৎ রাধানাথের মুখ দিয়া বাহির হইল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া হরিমোহিনী পুনরায় বলিলেন, "কথা কচ্ছিসনে যে?"

একটা ঢোক গিলিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া—রাধানাথ বলিল, "এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম নানা যায়গায়।"

"কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলি?"

"কাশীতে ছিলাম কিছু দিন, তার পর হরিদ্বার, হৃষীকেশ, কনখল, এই সব জায়গায় ঘুরে—"

হরিমোহিনী বলিলেন, "বল না, বলতে বলতে আবার থামলি কেন?"

রাধানাথ বলিল, "তারপর মুজাপুরের ওখানে প্রায় মাসখানেক ছিলাম, তার পর এদিকে ওদিকে বেড়িয়ে কলকাতায় এসেই জ্বর হোলো, সেখান থেকে আজ বাড়ী এসেছি।"

হরিমোহিনী এবার একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "দেখ বাধু, নিজের বুদ্ধিতে সব সময় ঠিক রাস্তাটা দেখতে পাওয়া যায় না তখন অন্য লোকের বুদ্ধি নিতে হয়। তাই বলছি এ রকম ভাবে ঘুরে বেড়িয়ে কি লাভ হবে সেটা বলতে পারিস আমাকে? ভগবান এই যে জীবনটা দিয়েছেন, সেটা কি কেবল বাজে খরচ করবার জন্যেই? এর মধ্যে কি একটুকুও সার্থকতা নেই মনে করিস?"

রাধানাথ মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "না, তা করিনে। কিন্তু আপনিই বলুন দিকিনি জেঠাইমা, যখন অন্য কোন কাজেই কোন সার্থকতা দেখতে পাওয়া যায় না, এখন নিতান্ত অকেজো কাজগুলোকেই সার্থক করে নিতে হয় না কি? আমার আছে কি বলুন তো। যে দিন বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছিলাম, সে দিন যে কতকথানি মনের দুঃখে বেরিয়েছিলাম, তা আমি ছাড়া আর

কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু আপনাকে যথার্থই বলছি জেঠাইমা, সে দিন ও অবস্থায় বাড়ী ছেড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় আমার ছিল না।"

রাধানাথের এই কথাগুলির ভিতর দিয়া তাহার সমস্ত হৃদয়খানি হরিমোহিনীর চক্ষের সম্মুখে প্রকাশ হইয়া গেল। তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আচ্ছা রাধানাথ তুই ভগবানকে মানিস্। ঠাকুর দেবতা? যদি কেউ ঠাকুরের কাছে কোন কিছুর জন্তে প্রার্থনা করে, তা হলে ঠাকুর সে কথায় কর্ণপাত করেন, এ তোর বিশ্বাস হয়?"

রাধানাথ বিস্মিত হইয়া হরিমোহিনীর মুখের দিকে চাহিল। হঠাৎ এ প্রশ্নের অর্থ কি তাহা সে বুঝিতে পারিল না। বলিল, "একেবারে যে মানিনে তা নয়, তবে প্রার্থনার মত প্রার্থনা যদি কেউ করে, তা হলে আমার বোধ হয় ঈশ্বর সেটা শোনেন!" বলিয়া পুনরায় বিস্ময়াকুল দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল।

হরিমোহিনী বলিলেন, "দেখ রাধু, যথার্থ বলছি, এদানীং তোর জন্তে মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যে করতে বসে বলতুম, "ঠাকুর ছেলেটার মনে সুমতি দাও, এইটুকুই আমার প্রার্থনা। তার পর আমার বাপের বাড়ী থেকে বেগুনফুলের চিঠি পেলুম। আমার বেগুনফুলকে তুই বোধ হয় জানিসনে রাধানাথ!"

রাধানাথ ঘাড় নাড়িল।

হরিমোহিনী বলিতে লাগিলেন, "বেগুন ফুলের একটী মেয়ে, আহাঃ বড় লক্ষ্মী মেয়েটী ছোট বেলায় তাকে কোলে করে দুধ খাইয়েছি, কত আদর করেছি, সেই মেয়েটীকে আমার হাতে দিয়ে বেগুনফুল বললে, "ভাই আজ থেকে আমার পুঁটুর ভাবনা আমি ছেড়ে দিলাম ভাই।" ওকে তোমাকেই দিলাম, তুমিই ওর ভার নাও।"

হরিমোহিনী থামিলেন। রাধানাথ তখনও বিস্ময় ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়াছিল। ব্যাপারটা যে ঠিক কি, তাহা তখনও সে কিছুমাত্র বুঝিতে পারে নাই।

হরিমোহিনী আবার বলিতে লাগিলেন, "সেই দিন আবার ঠাকুরকে বল্লাম যে ঠাকুর, মেয়েটীর ভার যখন তুমি দিলে, তখন আমার রাধানাথকেও ফিরিয়ে দাও। এদের সংসারী করে দিয়ে, আমরা তীর্থ করে বেড়াই। এ বয়সে আর কেন?"

একটু থামিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর আমার কথায় কাণ দিয়েছেন। তিন দিন না যেতে যেতেই তিনি তোকে আমার সামনে এনে দিয়েছেন। এইবার আমার কথাটী রাখ, আমাকে ভারমুক্ত করে দে।"

রাধানাথ বলিল, "ব্যাপারটা যে কি, তা তো আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে জেঠাই মা।"

জেঠাই মা বলিলেন, বুঝতে না পাল্লে চলবে কেন বাবা। এ রকম নাগা সন্ন্যাসীর মত কতদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? আমাদের আর কটা দিন। ছিঃ বাবা, ওসব খেয়াল ছেড়ে দিয়ে, বিষয় কর্ম্ম দেখ, দুটো সৎকাজ করো, দশজনকে প্রতিপালন করো, আমরা দেখে সুখী হই। তোমাদের সংসারী করে দিয়ে যেতে পারলে আমিও দায়মুক্ত। সেই জন্তেই বলছি রাধানাথ, আমার কথাটা অগ্রাহ্য করিসনে, পুঁটীকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি, তাকে তুই দেখ, আমি বলছি, সে কোন অংশে তোর অযোগ্য হবে না।"

এতক্ষণে আসল কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! বিবাহ!——এই কথাটা মনে হইবামাত্র তাহার প্রবাসকালের স্মৃতিগুলি তীক্ষ্ণ ছুরির মত তাহার সমস্ত দেহমনের ভিতরে বিঁধিতে লাগিল।

হরিমোহিনী বলিলেন,—"কি ভাবছিস্ রে রাধু! ডাকতে পাঠাবো পুঁটিকে?"

রাধানাথ তীব্রভাবে বলিয়া উঠিল,—"না, না, জেঠাইমা, সে কিছুতেই হ'তে পারে না।"

কিন্তু হরিমোহিনী কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি বলিলেন,—"কেন হ'তে পারে না শুনি?"

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিতান্ত সহজ নয়, তাই সে বলিল,

—"এখন আমার শরীরও ভাল নয়, মনও ভাল নয় জেঠাইমা। এ অবস্থায় আমি তো—"

বাধা দিয়া হরিমোহিনী বলিলেন,—"বেশ তো বাবা, আমি তো এখানি পুরুত ডাকিয়ে তোমাকে জোর ক'রে বিয়ে দিতে চাচ্ছিনে। তুমি বেশ ক'রে ভেবে দেখ, মনটা সুস্থির হোক, তারপর আমাকে বলো।"

রাধানাথ ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হরিমোহিনী আবার বলিলেন,—"আমার এ কথাটাও মনে রাখিস রাধানাথ, যে এরকম ক'রে দিন চ'ল্‌বে না। যাই করো যেখানেই যাও, নিজের মনে মনে এটা নিশ্চয় বুঝে রেখো, যে নিজে যতক্ষণ সংসারী হ'তে না পাচ্ছো, ততক্ষণ এই পৃথিবীর কোন জিনিষের ওপরেই তোমার জোর দখল থাক্‌বে না। কিন্তু একথাটাও বলে রাখি, এখন যেন কোন ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, কাশী, হরিদ্বার, কনখল ঘুরে বেড়ালে, কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে একবার চেয়ে বেশ ক'রে ভেবে দেখ দিকিনি, এইভাবে কি চিরকাল কাটাতে পারবে?"

রাধানাথ পূর্ব্ববৎ মাথা নিচু করিয়া স্থিরভাবে বলিল,—"আমাকে নিজে ভেবে একটু বুঝতে সময় দিন জেঠাইমা, তারপর আমি আপনার কথার উত্তর দেবো। এত বড় একটা সমস্যা কি এক কথায় মীমাংসা হ'তে পারে?"

হরিমোহিনী একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, তাই হবে।"

১৬

সেই রাত্রে নিজের শয্যায় শয়ন করিয়া রাধানাথ তাহার জেঠাইমার কথাগুলি যতই তোলাপাড়া করিতে লাগিল, ততই তাহার মনের ভিতর যেন একটা সুরাসুরের মন্থন চলিতে লাগিল। সন্ন্যাসী সাজিয়া, গেরুয়া পরিয়া, যে রাত্রে সে এই গৃহ হইতেই সংসারের বন্ধন হইতে বিদায় লইয়া অকূলে যাত্রা করিয়াছিল, সেইদিন হইতে বাবুগঞ্জের সেই লজ্জাজনক ঘটনাটী পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ঘটনাগুলিকে নিজের মনের মধ্যে বেশ করিয়া তোলাপাড়া করিয়াও সে অনেক চেষ্টাতেও আবিষ্কার করিতে পারিল না যে এই উদ্দেশ্যহীন জীবনটার মধ্যে সার্থকতা কোথায়।

জীবনের মধ্যে এমন অনেক মুহূর্ত্ত আসে যখন একটা অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ব্যাপারে—যেটা এতদিন পর্দ্দার আড়ালে ছিল, সেইটাই আবরণমুক্ত হইয়া বেশী করিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠে এবং কল্পনায় এতদিন যেটাকে অতি তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া আসিয়াছি, সেইটাই এমনি অতর্কিতভাবে তাহার সমস্ত বিপুলতা লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় যে তখন তাহার সম্মুখে নত হওয়া ছাড়া আর অন্য কোন পথ থাকে না।

সেদিনকার সেই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় চুপ করিয়া শুইয়া পড়িয়া রাধানাথ বেশ বুঝিতে পারিল যে তাহার এতদিনকার কীর্ত্তি-গুলির উপরে যে কালো যবনিকাখান আড়াল করিয়া দেওয়া ছিল, তাহার ওপাশে এমন অনেকগুলি ব্যাপার আছে, যাহা তুচ্ছ বলিয়াও উড়াইয়া দিতে পারা যায় না, অথচ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেও ভয় করে। এতদিন সে হাসিয়া, খেলিয়া অত্যন্ত লঘুভাবে যে জিনিষটাকে নাড়াচাড়া করিতেছিল, সেটা যে কত বড় গুরুতর ব্যাপার, তাহা সেই ডগমগপুরের মহুয়া-তলার কুটীর হইতে বাবুগঞ্জের সে রাত্রির ঘটনাটার কথা ভাবিয়াই সে বুঝিতে পারিল এবং অজানিত আশঙ্কায় তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল।

নিজের উপরে যতই সে ধিক্কার দিতে লাগিল, বনমালার উপরে ততই তাহার যেন শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। এই যে নারী —যে যৌবনে স্বামীকে হারাইয়াছে এবং হিন্দুর সমাজে যাহার জীবনের গণ্ডীটুকু বড়ই সঙ্কীর্ণ—সে কতখানি ত্যাগ ও সেবার দ্বারা তাহার হৃদয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। পীড়িত অবস্থায় সে তাহার শুশ্রূষা করিয়াছে, ব্যোমনাথের ভোগ রাঁধিতে গিয়া সন্ন্যাস জীবনের ছদ্ম অভিনয় যখন তাহার বড়ই কষ্টকর বলিয়া মনে হইতেছিল, এই নারীই তখন অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে তাহাকে নীজে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছে। তাহার সন্ন্যাসী

বেশের অন্তরালে যে পিশাচের আসল মূর্তিটী ছিল, তাহা তো সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কল্পনা করিতে পারে নাই।

তারপরে যেদিন একমুহূর্ত্তের উত্তেজনায় সে বাবুগঞ্জে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল এবং যে নারীকে সে এতদিন শান্ত, শীতল, ক্ষুদ্র জলধারার মত মনে করিয়াছিল, সেই নারীই যখন উদ্ধতফণা ফণিনীর মত তাহার দিকে তীব্র ভৎসনার দৃষ্টিতে চাহিল, তখন সে বুঝিল যে যাহার পশ্চাতে সে এতদিন উল্কার মত ছুটিয়া বেড়াইয়াছে, তাহার বর্ণ উজ্জ্বল হইলেও তবে তাহা তীক্ষ্ণ, তাহা খেলা করিবার সামগ্রী নহে, তাহা সাপ—বিষধর এবং জীবন্ত, ছেলেদের খেলা করিবার রবারের সাপ নহে।

মনের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বন্দ্ব যতই বাড়ীতে লাগিল, নিজের প্রত্যেক আচরণগুলি তাহার নিকট অতি ঘৃণিত বোধ হইতে লাগিল। এবং বনমালার মূর্ত্তিটী হঠাৎ তাহার মনের সম্মুখে যেন এক স্বর্গীয় মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

এইবার তাহার জেঠাইমার কথাটী মনের ভিতর স্পর্শ করিল। সে ভাবিল যে আর নয়, চিত্তবৃত্তিটীকে বন্যঘোড়ার মত ছাড়া রাখিলে আর চলিবে না, তাহাকে বাঁধিতেই হইবে। সুতরাং জেঠাইমার কথা শিরোধার্য্য, বিবাহই করিব।

এই সঙ্কল্পটা সে বার বার মনের মধ্যে যতই আলোচনা করিতে লাগিল, তাহার গুরুত্ব যেন বাড়িতে লাগিল। শেষে সে শয্যা হইতে উঠিয়া, সেই মুহূর্ত্তেই জেঠাইমার কাছে যাইবার জন্য ঘরের বাহিরে আসিল।

হরিমোহিনীর ঘরের দ্বারটী আধভেজান ছিল, সেটী সশব্দে ঠেলিয়া সে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "জেঠাইমা" এবং পরমুহূর্ত্তেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে গিয়া সম্মুখেই যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, পৃথিবীটা যেন পায়ের তলা দিয়া সরিয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হইল।

১৭

হরিমোহিনী ঘরের ভিতর বসিয়া পান সাজিতেছিলেন, রাধানাথের ডাক শুনিয়া বলিলেন,—"কেন রে রাধু?"

ঠিক তাহার পাশ দিয়া যে একটা ঝোড়ো হাওয়ার মত তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত করিয়া দিয়া বনমালা পাশের ঘরে চলিয়া গেল—রাধানাথ নির্ব্বাক বিস্ময়ে সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

হরিমোহিনী আবার বলিলেন,—"ঘরে এসে বোস না রে রাধু, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?"

রাধানাথ ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে আসিয়া হরিমোহিনীর সম্মুখে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, কিন্তু তখনও তাহার মাথার

ভিতর ঝিমঝিম করিতেছিল। নিজের দৃষ্টির ভ্রম হইল কিনা সে বিষয়েও সংশয় হইতে লাগিল।

হরিমোহিনী বলিলেন,—"আমাকে ডাকছিলি কেন রে?"

যে সংকল্প করিয়া সে এ ঘরে আসিয়াছিল, সেটা মনের ভিতর একটা মস্ত গোলমাল পাকাইয়া গেল। জলের যে ধারাটী বহিতেছিল, সেটী যেন হঠাৎ একটী মস্ত পাথরে ঘা খাইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। হরিমোহিনীর প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল বলিল,—"না, কিছু নয় জেঠাইমা, এমনিই এলাম।"

হরিমোহিনী একটা পান মুখে দিয়া বলিলেন,—"এইমাত্র যে মেয়েটী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—"

রাধানাথ সোজা হইয়া বলিল,—"ওটী কে জেঠাইমা?"

হরিমোহিনী বলিলেন,—"আমি বাপের বাড়ী গিয়ে ওকে নিয়ে এসেছি।"

রহস্যটী যেন আরও জটিল হইয়া উঠিল। বিস্মিত হইয়া সে বলিল,—"আপনার বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছেন?" এই বলিয়া সে আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কথাটা আটকাইয়া গেল।

হরিমোহিনী বলিলেন,—"মেয়েটী বিধবা। ওর বাপ পশ্চিমে কোথায় কাজ করে, আমার বাপের বাড়ীর গাঁয়ে এক

বুড়ো চক্কোত্তী মশাই আছেন, তুই বোধ হয় তাঁকে দেখে থাকবি, পূজোর সময় আগে আগে একবার আমাদের এখানে আসতেন, তিনিই ওকে রাস্তার ধারে একটা মন্দিরের রোয়াকে কুড়িয়ে পেয়েছেন।"

রাধানাথের বিস্ময় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইল। বলিল,—"কুড়িয়ে পেয়েছেন কি রকম?"

হরিমোহিনী বলিলেন,"আহা! মানুষের মনের কথা আর কেন বলিস বাবা! মেয়েটী গঞ্জনার জ্বালায় গঙ্গায় ডুবে মর্‌তে যাচ্ছিল।"

রাধানাথের হৃদ্‌পিণ্ডটী ধক্ ধক্ করিতে লাগিল, তাহার মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে বলিল, —"তারপর?"

হরিমোহিনী বলিতে লাগিলেন,—"আসলে যে কি ব্যাপার তা অবিশ্যি আমি জানিনে। মেয়েটীর শ্বশুরবাড়ী গঙ্গার ওপারে কি একটা গাঁয়। সেখানে একটা কথা রটনা হ'য়ে মেয়েটীকে বড়ই লজ্জা পেতে হ'য়েছিল। তাই মনের জ্বালায় গঙ্গায় ডুবে মর্ত্তে যাচ্ছিল। সেখান থেকে গঙ্গা তো নেহাৎ কমখানি নয়, তাই বোধ হয় আসতে পারিনি, একটা মন্দিরের চাতালে শুয়েছিল, তখন আমাদের চক্কোত্তী মশাই গরুর গাড়ী ক'রে সেই পথ দিয়ে আসছিলেন, তিনি দেখতে পেয়ে ওকে সঙ্গে ক'রে আকন্দপোতায় নিয়ে আসেন।"

রাধানাথ চুপ করিয়া এই কাহিনী শুনিতেছিল। একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

হরিমোহিনী বলিতে লাগিলেন,—"ওর বাপকে সেই দিনই চিঠি লেখা হ'য়েছে, এখনও কোন উত্তর পাইনি। সেখানে কোথায় বা থাকে, আর কেবা দেখে শুনে, তাই আমি আমার সঙ্গে ডেকে এনেছি। ওর বাপের চিঠি পেলেই পাঠিয়ে দেব'খন। আহা! বড় লক্ষ্মী মেয়েটা রে রাধু!"

হরিমোহিনী থামিলেন। রাধানাথ তখনও স্থিরভাবে বসিয়াছিল। তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল। হৃদ্‌পিণ্ডটা এত জোরে স্পন্দিত হইতেছিল যে তাহার মনে হইতে লাগিল বুঝি তাহার শব্দও হরিমোহিনী শুনিতে পান।

রাধানাথকে সেইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া হরিমোহিনী আবার বলিলেন,—"অমন চুপটী ক'রে ব'সে রইলি কেন রে রাধু?"

এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর ছিল না। রাধানাথ কেবল বলিল,—"বড় জল তেষ্টা পেয়েছে জেঠাইমা।"

জল পান করিয়া সে যেন একটু সুস্থ হইয়া বলিল,—"আচ্ছা জেঠাইমা, ওই যে মেয়েটীর কথা ব'ল্লেন, সে কবে ডুবে মরতে যাচ্ছিল?"

এই প্রশ্নে হরিমোহিনী যেন একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় যেদিন বনমালাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই তারিখটার কথা রাধানাথকে বলিলেন। রাধানাথ হিসাব করিয়া দেখিল যে সেটা তাহার বাবুগঞ্জ পরিত্যাগের দুইদিন পরের ঘটনা। সে সেদিন প্রবল জ্বরের তাড়নায় কলিকাতার মেসের বাসায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিল। সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া ভাবিয়া সে হঠাৎ এমনি করিয়া চমকিয়া উঠিল যে হরিমোহিনীও তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন,—"অমন ক'রে চমকে উঠলি কেন রে রাধু?"

রাধানাথ সে কথায় কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, সেটাও হরিমোহিনী লক্ষ্য করিলেন।

কয়েকমুহূর্ত্ত নিস্তব্ধতার পর হরিমোহিনী আবার বলিতে লাগিলেন,—"দেখ রাধানাথ, ব'ল্লে বোধ হয় তুই অবাক হ'য়ে যাবি, মেয়েটার উপর এই ক'টা দিনেই যেন একটা মায়া ব'সে গিয়েছে। আসবার সময় বুড়ো চক্কোত্তি মশাইও সেই কথা ব'লেছিলেন। কিন্তু যাই হোক, যেটা কর্ত্তব্য সেটা তো করতেই হবে বাবা! ওকে যেমন ক'রেই পারি, ওর বাপের কাছেই পাঠিয়ে দিতে হবে। তাই ব'লছিলাম যে, যদি এর মধ্যে সেখান থেকে চিঠির কোন উত্তর না পাওয়া যায়, তা হ'লে তুই বরং একবার সেই দেশে গিয়ে সন্ধানটা নিয়ে আসতে পারবি নে?"

রাধানাথ বলিয়া উঠিল,—"সেজন্তে ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন জেঠাইমা! খবর যদি সত্যি সত্যিই না আসে, তাহ'লে সেই সময় যা হোক করলেই হবে'খন। এখন হোতে অত তাড়াতাড়ি কেন?"

হরিমোহিনী বলিলেন,—"তবে তাই হবে।"

রাধানাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,"তবে এখন চ'ল্লাম জেঠাইমা!"

হরিমোহিনী বলিলেন,—"তোকে তখন যে কথাটা ব'লেছিলাম তার কি হোল?"

রাধানাথ পুনরায় মাথা নীচু করিল। সেই কথাটাকেই বলিবার জন্ত সে যে এঘরে আসিয়াছিল, একথা আর মুখ দিয়া বাহির হইল না। নিজের ঘরটীতে বসিয়া, মনের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করিয়া সে যাহা স্থির করিয়াছিল, তাহা একমুহূর্ত্তের মধ্যে একটি প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে বালির বাঁধের মত ভাসাইয়া দিল।

জেঠাইমার প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল বলিল,—"আজ বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি জেঠাইমা!" বলিয়াই মুখে একটা কাষ্ঠহাসি যেন জোর করিয়া আনিয়া বলিল,—"অত তাগাদা করলে তো পেরে উঠবো না জেঠাইমা! নিজের মনটার ওপর জোর দখল করা নিতান্ত সহজ কাজ বলে তো আমার মনে হয় না।

কথাটা শেষ হইবামাত্র একটা উচ্চ হাসির তরঙ্গ তুলিয়া সে আর দ্বিতীয় কোন কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার এই অসম্বদ্ধ হাস্য হরিমোহিনীর নিকট এমনি অদ্ভূত এবং বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইল যে তিনি ভ্রূকুটী করিয়া রাধানাথের দিকে একবার চাহিয়া তাহাকে পুনরায় ডাকিলেন। কিন্তু রাধানাথ তাহার পুর্ব্বেই বাহির হইয়া গেছে।

১৮

রাধানাথ চলিয়া যাইবার পরেই বনমালা আসিয়া হরিমোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,--"হাঁা মা, আমার বাবার কাছ থেকে কি কোন খবর আজও পাওয়া যায়নি ?"

হরিমোহিনী বলিলেন,—"না না, পাওয়া গেলে হয় তো চক্কোত্তী মশাই নিজেই ছুটে আসতেন। তিনিই চিঠি লিখেছেন, কাজেই তোমার বাবার উত্তর তাঁরই কাছে আসবে কিনা।" এই বলিয়া বনমালার চিবুকে হাত দিয়া আবার বলিলেন,—"কেন মা! এখানে আমার কাছে থাকৃতে কি তোমার ভাল লাগছে না?"

বনমালা কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হরিমোহিনী বলিলেন,—"আমি তাই এইমাত্র রাধানাথকে বলছিলাম, যে আরও চা'র পাঁচদিন দেখা যাক, তার মধ্যে

যদি তোমার বাবার কাছ থেকে কোন চিঠিপত্র না আসে, তাহ'লে সেই বরং একবার সেদেশে গিয়ে তোমার বাবাকে ব'লে——"

এ প্রস্তাবে বনমালা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল,—"না না, সে হবে না, সে কিছুতেই হতে পারবে না মা!"

হরিমোহিনী বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,—"কেন হ'তে পারবে না মা? আমি তো তাতে কোন দোষ দেখি নে। আমার বরং মনে হয় যে চিঠি লিখে জানানোর চেয়ে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা পরিষ্কার ক'রে বলাই ভাল। সেই জন্তেই ব'লছিলাম যে রাধানাথ না হয় গিয়ে——আর ওর ছেলেবেলা থেকেই দেশ বিদেশে ঘোরা অভ্যাস। এই দেখ না কেন, কর্ত্তার সঙ্গে বকাবকি ক'রে এই ক'টা মাস যে কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে,তা ওই জানে,আর ঈশ্বরই জানেন। চেহারাটা তো শুকিয়ে একেবারে দাঁড় হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু ও যাই করুক, আমি তো ওকে ছেলেবেলা থেকে জানি, আমার কথা ও কিছুতেই ঠেলতে পারবে না। আমি যদি ওকে তোমার বাবার কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে বলি, তাহ'লে ও নিশ্চয় আমার কথা রাখবে।"

বনমালার সর্ব্বাঙ্গে যেন ছুঁচ ফুটিতেছিল। সে কেবলমাত্র বলিল,—কাজ কি মা! আর ওঁকে শুধু শুধু কষ্ট দিয়ে। তার

চেয়ে আমাকে বরং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছেই পাঠিয়ে দিন না। আমি সেইখানেই না হয় এই দুটো দিন থাকি।"

হরিমোহিনী ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন,—"সেখানে তোমার থাকবার সুবিধে হবে না বলেই তোমাকে এখানে আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছি। চক্রবর্ত্তী মশাইয়ের বাড়ীতে অন্য কোন লোক জন নেই, কাজেই মা, জানো তো পাড়াগাঁয়ের লোকেদের দশা, একটা কথা উঠতে আর কতক্ষণ ?"

বনমালা আর কোন কথা কহিল না দেখিয়া হরিমোহিনীও নীরব হইলেন।

কিন্তু বনমালার মনে যে একটি চাঞ্চল্যের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে সেটি হরিমোহিনী স্পষ্টই লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটি সন্দেহ করিবার কোন কারণই তাঁহার ছিল না, তাই তিনি মনে করিলেন যে এই চাঞ্চল্যের মূল কারণ পিতামাতার সঙ্গে মিলিত হইবার একটি অদম্য ইচ্ছা।

পরদিন প্রাতেই তিনি রাধানাথকে ডাকিয়া বলিলেন,—"রাধু! ঐ যে মেয়েটির কথা কাল তোকে বলছিলাম, ও তো আর এখানে থাকতে চায় না।"

রাধানাথ চমকিয়া উঠিল। বলিল,—"কেন ?"

হরিমোহিনী হাসিয়া বলিলেন,—"কেন কি রে ? ছেলেমানুষ,

বাপ মার জন্যে আর মন কেমন করে না! তা, তুই বাবা, একটি কাজ কর।"

রাধানাথ বলিল,—"কি?"

"আরও দিন কতক দেখি, যদি তার মধ্যে ওর বাপের কোন খবর না পাওয়া যায়, তা হলে চক্রবর্ত্তী মশাইয়ের কাছ থেকে ঠিকানা জেনে নিয়ে, তোকে একটীবার সেই দেশে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে, মেয়েটীর বাপের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বুঝিয়ে সব কথা বলে, তার পর ওকে সেখানে রেখে আসার ব্যবস্থা করতে হবে।"

রাধানাথ এ কথায় কোন উত্তর না করিয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল। হরিমোহিনী বলিলেন,—"আমি আজ বরং বিকেলে একবার সরকার মশাইকে পাঠিয়ে দেবখন আকন্দপোতা। তিনি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে জেনে আসুন যে কোন খবর এসেছে কি না।"

রাধানাথ শুষ্ককণ্ঠে কেবল বলিল,—হ্যাঁ, সেই বেশ ভাল হবে।"

হরিমোহিনী চলিয়া গেলেন। রাধানাথ তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দেহের সমস্ত স্পন্দনশক্তি যেন লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। বনমালার মোক্তারপুর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার ইচ্ছাটির প্রকৃত কারণ যে সে নিজে এবং

তাহাকেই এই বাড়ীতে দেখিয়া সে যে এখান হইতে চলিয়া যাইতে চাহিতেছে, এটুকু বুঝিতে তাহার মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের কৃতকার্য্যকে শতবার ধিক্কার দিতে তাহার ইচ্ছা হইল।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর হরিমোহিনী তাঁহার ঘরে বসিয়া নিয়মিত রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় রাধানাথ সেখানে আসিয়া বসিল।

হরিমোহিনী বলিলেন,—"কি রে রাধানাথ?"

রাধানাথ বলিল,—"দেখুন জেঠাইমা, অনেক ভেবে দেখলাম যে চুপটী করে এই রকম বাড়ীতে বসে থেকে কিছুই লাভ নেই।"

হরিমোহিনী হাসিয়া, বইখানি মুড়িয়া রাখিয়া বলিলেন, —"কিসে লাভ আছে শুনি?"

"না আমি সে কথা বলছি নে। আমি বলছি যে যা'হোক একটু কিছু করা তো চাই। বাড়ীতে বসে, খেয়ে আর ঘুমিয়ে কাটানো সেটা যে কেবল একঘেয়ে তা নয়, তাতে শরীরটাও নষ্ট হবার ভয় আছে।"

"তা আছে বৈ কি। তা, কি বলতে চাচ্ছিস বল?"

রাধানাথ একটু কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, —"সেই কথাই বলছি। একবার আমি হোমিওপ্যাথিক

শিখতে কল্‌কাতায় গিয়েছিলাম তা তো জানেন। সেইটে আবার ভাল করে একবার ঝালিয়ে নিয়ে কলেজের একটা একজামিন পাশ করে, বিদ্যেটাকে ভাল করে শিখে নেওয়া যে খুব দরকার সেটা আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি। এই গ্রামেই দেখুন না কেন, একটা ভাল ডাক্তার নেই, বদ্যি নেই, কিছুই নেই। পাশের গাঁয়ে যে ডাক্তার বাবুটী আছেন, তাঁর পেট ভরিয়ে নিয়ে আসতে পারে এ রকম লোক আমাদের দেশের চাষাভূষোর মধ্যে তো নেই বল্লেই হয়, ভদ্রলোকের মধ্যেও খুব কম আছে বলেই আমার তো মনে হয়। অথচ দেখুন, প্রত্যেক বছরেই কতগুলো করে লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। এখন আমি যদি এই হোমিও-প্যাথিকটা একটু ভাল করে শিখে এইখানে একটি দাতব্য ডাক্তার খানা খুলি, যাতে সকলেই বিনা পয়সায় ওষুধ পাবে, তাহলে সেটা কেমন হয় বলুন দিকিনি জেঠাইমা।"

কথার শেষের দিকটা বলিবার সময় রাধানাথের কণ্ঠস্বরটা অস্বাভাবিক রকমের ভারি হইয়া উঠিল, তাহার মনের সম্মুখে তখন জলন্ত ভাবে বিরাজ করিতেছিল—বাবুগঞ্জে তাহার ডাক্তারীর ভীষণ অভিনয় এবং তাহার পরিণামটা!

রাধানাথের দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া হরিমোহিনী অতি সহজ ভাবেই বলিলেন,—"তা কাজটা খুবই ভাল বৈ কি। যাতে দেশের উপকার দশের উপকার হয়, তার চেয়ে কি আর কিছু

আছে রে বাবা। তা, কর্তার সঙ্গে পরামর্শ করে দেখ, তিনি কি বলেন, তার পর যা হয় কল্লেই হবে। এর জন্যে তো আর কিছু তাড়াতাড়ি নেই।"

কিন্তু হোমিওপ্যাথির উপর তাহার এই আকস্মিক অতি প্রবল অনুরাগের আসল কারণটা যে মোক্তারপুর হইতে যে কোন উপায়ে তাহার দূরে থাকিবার চেষ্টা,—অন্ততঃ যতদিন বনমালা সেখানে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার নিকট থাকা যে কোন মতেই রাধানাথের অভিপ্রায় নহে, সেটা হরিমোহিনী আদৌ বুঝিতে পারেন নাই।

রাধানাথ বলিল,—"তাড়াতাড়ি আছে বৈ কি। ওই জন্যেই তো আমাদের কিছু হয় না। আজ যে সঙ্কল্পটি মনের ভেতর উঠেছে, কাল হয়ত সেটা নিবে যেতে পারে, এই যে একটা উদ্যমের পরিণাম কতখানি মহৎ, তা বোধ হয় আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না। আমি তো মনে কচ্ছি যে আজই কিম্বা কাল সকালের ট্রেণেই কলিকাতা গিয়ে আমার সেই সাবেক স্কুলটিতে ভর্ত্তি হয়ে পড়ি। একটা সৎকাজে যতই দেরী করা যায় ততই ক্ষতি। যে মেসটিতে আমি আগে ছিলাম, সেই খানেই বাসার বন্দোবস্ত হতে পারবে। এই যে সেদিন জ্বর হয়ে এসে সেখানে উঠলাম, উঃ—তারা কি যত্নটাই না কল্লে! তারা বলতে লাগল——"

কথাটাকে চাপা দিবার জন্য হরিমোহিনী বলিলেন,—"হ্যাঁরে রাধানাথ, আমি তোকে যে কথাটা বল্লুম, সেটার কি ঠিক কর্‌লি ?"

"কোন কথাটা ?"

তোর বিয়ের কথাটা। পুঁটুকে আমি যে এখানে নিয়ে এলুম, সেটা কি লোক দেখাবার জন্যে।"

রাধানাথ চঞ্চল ভাবে বলিয়া উঠিল,—"সে সব এখন কিছু ভাল লাগ্‌ছে না জেঠাই মা। আমার——"

"ভাল লাগছে হোমিওপ্যাথিক শিখতে ? ডাক্তারি করতে ? কেমন—না ? সে সব কথা আমি কিন্তু শুনবো না। তোমার বিয়ে দিয়ে, তোমাকে সংসারী করে, আগে আমি নিশ্চিন্ত হই, তখন তুমি হোমিওপ্যাথিকই শেখো, আর কবিরাজীই শেখো, তাতে আমার একটুও আপত্তি নেই। কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনে রেখো বাবা, আমি যেটা করবো, সেটা তোমারই ভালর জন্যে করবো। তুমি যে যখনই ইচ্ছে হবে, তখনই বুনো পাখীর মত এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, তা আমি আর হ'তে দেব না, এটা আমি নিশ্চয় বলে রাখছি।"

বলিয়াই হরিমোহিনী উঠিয়া ত্বরিতপদে অন্যঘরে চলিয়া গেলেন।

১৯

ওপাড়ার মুখুয্যেদের বাড়ী কি একটা ক্রিয়া উপলক্ষে পরদিন হরিমোহিনীর নিমন্ত্রণ ছিল, তিনি পুঁটুরাণীকে লইয়া প্রাতেই সেখানে চলিয়া গেলেন। বনমালা বিধবা বলিয়াই হউক কিম্বা অজ্ঞাতকুলশীল বলিয়া হউক তাহাকে একটা সামাজিক আমন্ত্রণে লইয়া যাওয়াটা হরিমোহিনী ঠিক যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না।

এই ব্যাপারটির কিছুই রাধানাথ জানিত না, সুতরাং সে দ্বিপ্রহরে হরিমোহিনীর কক্ষের সম্মুখে আসিয়া—"জেঠাইমা" বলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই সেখানে বনমালাকে দেখিয়া বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

পরমুহূর্ত্তেই সে বাহিরে আসিবার জন্য যেমন পা বাড়াইয়াছে, অমনি তাহার বিস্ময়কে একেবারে সীমার বহুদূরে তুলিয়া দিয়া হঠাৎ বনমালা পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল,—"দাঁড়ান।"

রাধানাথ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। পাশের কোন ঘরে হরিমোহিনী আছেন কি না এবং তিনি ইহার এই কথা শুনিতে পাইয়াছেন কি না, তাহা বুঝিবার জন্য সে ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া, এবং স্বরটিকে একটু খাটো করিয়া বলিল, "জেঠাইমা কি এ ঘরে নেই?"

বনমালা অত্যন্ত সহজ স্বরে তাঁহার ক্রিয়াবাড়ীতে গমনের

কথা জানাইল। এবং পরমুহূর্ত্তেই একটু তীব্রভাবে রাধানাথকে বলিতে লাগিল, "আমি আপনার কি শত্রুতা করেছি যে আপনি আমার সঙ্গে এ রকম করছেন ?"

রাধানাথ অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল,—"কেন কি করেছি আমি ?"

বনমালার স্বরের তীব্রতা এবার বাড়িয়া গেল।—"কি করেছেন ? কেন, তা আপনি জানেন না ? আমাকে কি কোথাও গিয়ে একটু শান্তিতে থাকতে দেবেন না ? যেখানে আমি যাব সেইখানেই কি আপনার যেতে হবে ? কেন, কি ক্ষতি আমি আপনার করেছি ?"

রাধানাথ হতবুদ্ধির মত বলিল,—"এটা যে আমার—আমাদের বাড়ী।"

বনমালা বলিল,—"তা আগে জানতুম না। এখন জেনেছি বলেই এখান থেকে চলে যাবার জন্যে আমার আগ্রহ হয়েছে।"

রাধানাথ চাহিয়া দেখিল যে, বনমালার দুই চক্ষু দিয়া যেন অগ্নির রেখা বাহির হইতেছে। মনে পড়িল যে এমনিই তীব্র জ্যোতিঃ আর একদিন বাবুগঞ্জে তাহার রুগ্ন শয্যায় সে দেখিয়াছিল! সে বলিল,—"আমিও যে মুহূর্ত্তে সেটা বুঝতে পেরেছি, সেই মুহূর্ত্তেই জেঠাইমার কাছে বলেছি যে আপাততঃ আমার কলকাতায় না গেলে আর চলছে না।"

বনমালা এবার যেন একটু শ্লেষের স্বরে বলিল,—"কেন আপনার বাড়ী, আপনি চলে যাবেন কেন? আমিই খড়ের কুটোর মত ভেসে এসেছি, আবার ভেসেই যাব।"

রাধানাথ বলিল,—"না, তা হবে না। আমি অনেক ভেবে দেখেছি যে এ অবস্থায় আমার পক্ষে এখন কলিকাতায় গিয়ে থাকাই মঙ্গল।"

বনমালা এবার যেন ভৎসনার স্বরে বলিল,—দেখুন গঙ্গায় ডুবে মরতে যাচ্ছিলুম, আমার অদৃষ্টে গঙ্গা নেই তাই মরতে পারলুম না, কিন্তু শেষটা এখানকার পুকুরে ডুবে মরবো এইটাই কি আপনার ইচ্ছে? চুপ ক'রে রইলেন কেন? বলুন? একবার ভেবে দেখুন দিকিনি আপনার জন্যে আমার কতখানি গিয়েছে। আজ সমাজে আমার স্থান নেই, শ্বশুর বাড়ীতে আমি ঢুকতে পাবো না। বাবার যদি দয়া হয়, তবেই আমার এখনও একটী আশ্রয়ের স্থল কেবল আছে, নইলে গঙ্গাতেই বলুন, আর পুকুরেই বলুন, তাছাড়া আর অন্য আশ্রয় আমার নেই।"

রাধানাথের সর্ব্বাঙ্গে কে যেন চাবুক মারিল। সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল,—"সেজন্যে নিজের মনের কাছেও যথেষ্ট দোষী হ'য়েছি, আর তার জন্যে আমার অনুতাপও বড় কম হয়নি। আজ আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, আপনি আমাকে মাপ করুন।

একটা মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় আমি যে কতবড় একটা কুকাজ ক'রে ফেলেছি, এটা আগে যদি বুঝতে পারবার শক্তি আমার থাকতো, তাহ'লে আর যাই হোক, অন্ততঃ সমাজের কাছে আপনাকে এতটা খাটো হ'তে হোত না।"

কিন্তু বনমালা পূর্ব্ববৎ তীব্রস্বরে বলিতে লাগিল,—"কেবল সমাজের কাছে খাটো হওয়া? তাছাড়া আর কিছু নয়! এ অবস্থায় আমার আত্মহত্যা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই, এটা কি আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না? অন্য জাতের মধ্যে কি হয় বলতে পারিনে, কিন্তু আমাদের হিন্দুর ঘরে যে বিধবার কাছে স্বামী সধবার চেয়েও বেশী আপনার জিনিষ। তা'ছাড়া আমাদের আর কিছুই যে মনে আনতেও পাপ। আপনি কি তা জানেন না?"

রাধানাথ ঘাড় হেঁট করিয়া নীরব রহিল। বনমালা বলিতে লাগিল,—"আপনি যখন অসুখ হ'য়ে প্রথম আমাদের বাড়ী যান, সেদিন আপনি যদি আজকের এই পোষাকে যেতেন, তাহ'লে পরপুরুষ জেনে কিছুতেই আমি আপনার সামনে বেরুতে পার্ত্তুম না। কিন্তু আপনি সন্ন্যাসী সেজে গিয়েছিলেন বলেই, আপনার সেবা-যত্ন করেছিলুম। কিন্তু তখন যদি একটুও বুঝতে পারতুম যে আপনার গেরুয়াগুলোর তলায় আমার সর্ব্বনাশের ছুরী লুকোনো র'য়েছে, তা'হলে বোধ

হয়——” বনমালার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এতগুলি কথা শুনিয়াও রাধানাথ একটুও অসন্তুষ্ট হইল না। বনমালার চক্ষে জল দেখিয়া তাহার হৃদয়খানি করুণায় ভরিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে বলিল,—“আমি আবার বলছি যে একটা ভুল যদি মানুষ ক’রে ফেলে, তার কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই? আমি দোষ করেছি, নিজেই তার জন্যে মনে ব্যাথা পেয়েছি, কিন্তু আপনি যদি সত্যি সত্যিই আমাকে ক্ষমা কর্ত্তে না পারেন, তাহ’লে আপনি যে শাস্তি দেবেন, আমি তাই মাথা পেতে নেব।”

বনমালা বলিল,—“আপনি এখনও নিজের মনকে জয় করতে পারেন নি। তাই এখনও আমার ভয় হয় যে যদি এখান থেকে আমি অন্য কোথাও গিয়ে থাকি, হয়তো সেখানেও আবার আপনি কোন মূর্ত্তিতে গিয়ে—”

বনমালার স্বর কাঁপিতে লাগিল, কথাটাকে সে আর শেষ করিতে পারিল না।

রাধানাথ পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। বনমালার কথায় এবার আর কোন প্রত্যুত্তর করিল না।

কয়েক মিনিটকাল নীরব থাকিয়া বনমালা আবার বলিল,—“দেখুন, আজ লজ্জার মাথা খেয়ে, আপনাকে অনেক

কথাই বল্লুম, তার জন্যে কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আমার মনের ভিতর যে কি যন্ত্রনাটা হ'চ্ছে, তা' যদি একবার দেখতে পেতেন তাহ'লে বুঝতেন, যে কত জালায় আমি এতগুলো কথা আপনাকে ব'লছি। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ?"

"বলুন।"

বনমালা একটু থামিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—"যদি কোন দিন, এক মিনিটের জন্যও আমার মঙ্গল কামনা ক'রে থাকেন তাহ'লে আমার এই কথাটা রাখুন। আপনি বিবাহ করুন। ছিঃ! ছিঃ! ভেবে দেখুন দিকিনি, কি ঘৃণিত কাজ আপনি করেছেন। আমি হিন্দু-কুলবধূ, বিধবা, আমার পেছনে পেছনে সেই ভগমগপুর থেকে কোথায় বনের ভিতরে বাবুগঞ্জ, সেখানে পর্য্যন্ত ছুটে বেড়িয়ে, নিজেও মনের কাছে দোষী হোলেন, আমাকে তো সর্ব্বনাশের মাঝখানে ছেড়ে দিলেন। আজ আপনার মনে অনুতাপ এসেছে, কিন্তু কাল হয় তো আবার ওটুকু হাওয়ায় উড়ে যাবে। তখন আবার হয় তো কি একটা ক'রে ব'সবেন তার ঠিক নেই। তার চেয়ে বিবাহ করে সংসারী হওয়াটা কি ভাল নয় ?"

রাধানাথ যন্ত্র-চালিতের মত বলিল,—"আচ্ছা তাই হবে।"

বনমালা বলিল,—"আমাকে আপনার ছোট বোনটীর

মত মনে ক'রে আমার এই কথাটা রাখুন। এইটুকু আমার অনুরোধ।"

রাধানাথের সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া যেন হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে বলিল,—"অপনার কথাই মেনে নিলাম, আপনাকে আমি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী ছোট বোনটীর মতই মনে করবো, আপনি আমার সব দোষগুলো মনের ভিতর থেকে মুছে ফেলে নেবেন। কিন্তু এইবার বলুন, আর তো আমার ভয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবার কারণ থাকবে না।"

বনমালা নীরব রহিল। রাধানাথও কয়েক মুহূর্ত্ত চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

২০

ব্যাপারটীকে মনের মধ্যে অনেকবার নাড়াচাড়া করিবার পর হরিমোহিনী হঠাৎ যেন আসল ঘটনাটুকুর একটু আভাষ বুঝিতে পারিলেন। বনমালাকে ডাকাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখ মা! রাধানাথের মনের ভাব তো আমি কিছুই বুঝতে পারিনে। এই সেদিন দেশ বিদেশ ঘুরে এলো, আবার এরই মধ্যে যে ক'ল্‌কাতায় যাবার জন্যে ওর এত ছুতো কেন তা তো জানিনে। তা মা! একটা কথা বলি,

কিন্তু কিছু মনে ক'রো না। আচ্ছা, রাধানাথকে তুমি কি আগে থেকে চিনতে?"

বনমালার মুখখানি একমুহূর্ত্তে যেন পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল; সে বলিল,—"একথা জিজ্ঞেস কচ্ছেন কেন মা!"

হরিমোহিনী বলিলেন,—"অবিশ্যি এটা কেবল আমার মনের অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়। আমার তো মনে হয় যে রাধানাথ তোমাকে দেখতে পেলেই যেন কেমন একটু চমকে ওঠে, ভাল ক'রে কোন দিকে চাইতেও পারে না, যেন জড়সড় হ'য়ে উঠে। সেই জন্যেই তোমাকে জিজ্ঞেস ক'রছি।"

বনমালা মাথাটা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"হ্যাঁ চিন্‌তুম।"

হরিমোহিনী চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"সত্যি? দেখলে মা! তাহ'লে তো আমি ভুল করিনি।"

"না।"

হরিমোহিনীর মুখ আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ক'রে চেনা পরিচয় হোল? কোথায়, তোমার বাপের বাড়ীতে না শ্বশুর বাড়ীতে?"

বনমালা পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে বলিল,—"বাপের বাড়ীতে।"

"বাপের বাড়ীতে। তা'হলে তোমার বাপের সঙ্গে ওর পরিচয় আছে?"

"হ্যাঁ।"

হরিমোহিনীর মনে মস্ত খটকা বাধিল। বনমালার সহিত যে তাহার পরিচয় আছে, এ কথাটী রাধানাথ তবে এতদিন কোন ভাবেই প্রকাশ করে নাই কেন? এ সমস্যাটী যতই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মুখের গাম্ভীর্য্য বাড়িতে লাগিল।

বনমালাকে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা বাছা, সত্যি ক'রে বল দিকিনি, বাপের বাড়ী ছাড়া আর অন্য কোথাও কি ওর সঙ্গে দেখা হয়নি?"

বনমালা কথাটীকে চাপা দিবার জন্য বলিল,—"যাই মা! ছাদ থেকে কাপড়গুলো তুলে নিয়ে আসিগে।" বলিয়াই হরিমোহিনীর আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে ঘর ছাড়িয়া দ্রুত চলিয়া গেল।

হরিমোহিনীর মনের ভিতরে যেন একটা ঝড় বহিতে লাগিল। ইহাদের পরস্পর পরিচয়ের মধ্যে যে একটা গূঢ় রহস্য নিহিত আছে, তাহা তিনি পূর্ব্বেই কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। এখন প্রকৃত ব্যাপারটী কি, সেইটুকু জানিবার জন্য তাঁহার মন বড়ই ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

রাধানাথকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া তিনি বলিলেন,—"রাধু! তোর সেই হোমিওপ্যাথিকের কি হোল রে?"

রাধানাথ বলিল,—"সেই কথাটাই তো ভাবছি জেঠাইমা! শিখতে অন্ততঃ দুই তিন বছর লাগবে, তারপর আরও অন্ততঃ একটা বছর একজন ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের সঙ্গে বেড়ালে তবে একটু জ্ঞান হবে। তাহ'লে ধরুন এই গিয়ে চা'র পাঁচ বছর।"

হরিমোহিনী বলিলেন,—"তা একটা জিনিষ ভাল ক'রে শিখতে আর চা'র পাঁচ বছর লাগবে না! সেই জন্তেই তো বলছি বাপু, যে আর সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি? শিখতে যদি হয়, তবে এদিকে যতই দেরী করবে, শেষের দিকেও ততই দেরী হ'য়ে যাবে।"

রাধানাথ বলিল,—"সেই জন্যেই তো ইতস্ততঃ করছি। এই সময়টা শুধু শুধু নষ্ট না ক'রে, অন্য কোন দিকে মন দিলে ঢের উপকার। আর দাতব্য ডিস্‌পেন্সারী যদি করতেই হয়, তাতে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে মাসে মাসে কিছু মাইনে দিয়ে রাখলেই চলবে।"

পূর্ব্বদিনে রাধানাথের কলিকাতা যাইয়া ডাক্তারী শিখিবার সঙ্কল্পটা যে একদিনেই এইরূপে উল্‌টাইয়া যাইতে পারে, তাহা হরিমোহিনী কল্পনাও করিতে পারেন নাই। রাধানাথের কথা

শুনিয়া তিনি একটু রাগতঃভাবেই বলিলেন,—"জানিনে বাছা তোমাদের মনের ভাব। যা বোঝ তাই করগে।"

রাধানাথ কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু কথাটা তাহার মুখের কাছে আসিয়া আটকাইয়া গেল।

হরিমোহিনী বলিলেন,—"তা তোমার বিয়ের কথাটা যা ব'লেছিলাম, তার কি স্থির হোল? আমি যে পরের মেয়েকে নিয়ে এসে শেষে লোক হাসাব, তা আমি পারবো না কিন্তু ব'লে দিচ্ছি। তোমাদের যে রকম নিত্যি নূতন মনের ভাব তাতে আমার তো কোন কথায় কথা কওয়াই ঝকমারি।"

হরিমোহিনীর এই অকস্মাৎ বিরক্তির ভাব দেখিয়া রাধানাথ মনে মনে ব্যথিত হইল। বলিল,—"আমি তো সে রকম কিছু মনে করিনি জেঠাইমা! হোমিওপ্যাথিকের কথাটা আমি নিজেই ব'লেছিলাম, আবার নিজেই ভেবে চিন্তে দেখলাম যে নানা কারণে সেটা সুবিধেজনক নয়। বিয়ে করার কথাটা যা বলছেন, তাতে তো আমার অমত করবার কথা কিছুই আমি বলিনি।"

হরিমোহিনী বলিলেন,—"তাহ'লে তোমার অমত নেই?"

রাধানাথ বলিল,—"না।"

"পুটুর মাকে তাহ'লে আমি চিঠি লিখি?"

কয়েকমুহূর্ত কি ভাবিয়া রাধানাথ বলিল,—"তা লিখুন।"

হরিমোহিনীর চক্ষের সম্মুখে যে অন্ধকারটা জমিয়াছিল, সেটা একমুহূর্ত্তে পরিষ্কার হইয়া গেল। হরিমোহিনী বলিলেন,—"সেই ভাল বাবা! বিয়ে থা' ক'রে তুমি এইখানেই ব'সে বিষয়কর্ম্ম দেখ, আমরা বুড়ো বয়সে তীর্থ ধর্ম্ম ক'রে বেড়াই; কি হবে তোমার সেই হোমিওপ্যাথিক শিখে। তিন চারটে বছর কি সোজা কথা। একটা দাতব্য ডাক্তারখানার জন্যে তোমার তিন চা'র বছর সময় নষ্ট করতে আমি তো কিছুতেই বলতে পারিনে।"

রাধানাথের ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসির রেখা দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল।

২১

ইহার ২।৩ দিন পরেই নন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বয়ং মোক্তারপুরে আসিয়া হরিমোহিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,—"মা, চিঠির উত্তর পেয়েছি বটে, কিন্তু ব্যাপারখানা তো আমার বড় ভাল বলে বোধ হয় না। এই দেখ মা চিঠি, আমি সঙ্গে করেই এনেছি, তুমি পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।" বলিয়া সিদ্ধেশ্বর মিত্রের পত্রখানি তাঁহার জামার পকেট হইতে বাহির করিয়া হরিমোহিনীর সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন।

পত্রখানি পড়িয়া হরিমোহিনীরও মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল।

এই অপরিচিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্রোত্তরে সিদ্ধেশ্বর বাবু জানাইয়াছেন যে প্রকৃত ঘটনাটী ইতিপূর্ব্বে তাঁহার বৈবাহিক মহাশয় তাঁহাকে পত্রযোগে অবগত করাইয়াছেন, সুতরাং চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরও নিকট যাহা অজ্ঞাত, তাহাও তিনি জানিয়াছেন। তাঁহার কন্যা যে কলঙ্কিনী হইবে ইহা তিনি জীবিত থাকিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহার স্ত্রী বহুদিন হইতেই কাশরোগে ভুগিতেছিলেন, তিনি এই সংবাদ শুনিয়াই শয্যা লইয়াছেন, এবং চুনারের ডাক্তারবাবু তাঁহার জীবনের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ আশাপ্রদ নহে। এই সকল অশান্তিতে তাঁহার মন একেই ভাল নয়, তাহার উপর আবার এই সকল নূতন অশান্তির কথা চিন্তা করিবার সময় তাঁহার নাই। স্বেচ্ছায় যে কন্যা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি নিজের যতই মমতা থাকুক না কেন, নিজের কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হইবার ইচ্ছা আপাততঃ তাঁহার নাই।

চিঠিখানির শেষভাগে একটী পুনশ্চ দিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে মেয়েটী যদি স্বইচ্ছায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকটে এখন থাকিতে চায়, তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু স্ত্রীর এই সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় তাঁহার নিকট হইতে এতদূরে যাইবার উপায় তাঁহার এখন নাই। স্ত্রী একটু ভাল হইলে তিনি যাইতে পারেন।

পত্রখানি পড়িয়া হরিমোহিনী তাহা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হাতে দিলেন। তিনি সেখানিকে পুনরায় তাঁহার জামার পকেটে রাখিয়া বলিলেন,—"দেখলে তো মা, কি রকম ভাসা ভাসা চিঠিখানি। এ অবস্থায় আমি বুড়ো মানুষ আমি যে কি করবো তা তো ভেবেই পাইনে। সেই জন্যে আজ তোমারই কাছে এসেছি।"

হরিমোহিনীও সমস্যায় পড়িলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি আশা করিয়াছিলেন যে রাধানাথকে সেখানে পাঠাইবেন, কিন্তু তাহার পরের ঘটনাগুলিতে সে আশা নির্ম্মূল হইয়াছে; তবে সিদ্ধেশ্বরবাবুর পত্রখানির প্রত্যেক ছত্রে যে স্নেহের অভিমান ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেটা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

বনমালার এবং রাধানাথের পরিচয়ের অন্তরালে যে একটা গোপন রহস্য লুক্কায়িত আছে, সে বিষয়ে হরিমোহিনী এক প্রকার নিঃসংশয় হইয়াছিলেন, সুতরাং এখন বনমালাকে লইয়াই তাঁহার সমস্যাটা সব চেয়ে বড় হইয়া দাঁড়াইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বলিলেন,—"এখন কি করবো বলুন দেখি চক্রবর্ত্তী মশাই?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন,—"কি করবে মা, তাই বলবো আমি? পরামর্শ নেবার কি আর তুমি লোক পেলে না মা?"

হরিমোহিনীর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"দেখুন চিঠিতে যাই কেন লেখা থাকুক না, এটা ঠিক জানবেন যে বনমালার বাপ নিশ্চয়ই ২।৫ দিনের মধ্যে এসে পড়বেন। সমাজের কাছে সে দোষই করুক আর যাই করুক তাঁর কাছে তো সে নিজের মেয়ে ছাড়া আর কিছু নয়। কতদিন তিনি অভিমান করে থাকবেন।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"হাঁা, সেটা যা বলেছ মা, সে কথা আমি একশোবার মানি।"

হরিমোহিনী বলিলেন,—"তা হলে, ধরুন গিয়ে, তিনি যদি আসেন, তো আপনার ওখানেই আসবেন, আমার এখানকার ঠিকানা তো আর তাঁর জানা নেই। তিনি জানেন যে মেয়ে আপনার কাছেই আছে। এ অবস্থায় আমি তো মনে করি যে বনমালাকে এখন আপনার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রেখে দেওয়া উচিত।

বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিস্মিত হইলেন। এই বনমালাকেই যখন তিনি নিজের সঙ্গে লইয়া আসেন, তখনকার আগ্রহের সহিত এখনকার বিপরীত ভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি ইহার কারণটা খুঁজিয়া পাইলেন না। বলিলেন,—"আমার বাড়ীতে? সেখানে থাকাটা যে ঠিক সঙ্গত নয়, তা তো মা, তুমিই একদিন বলেছিলে।"

হরিমোহিনী বলিলেন,—"তখন তো ওর বাপের কাছ থেকে এরকম চিঠিটা পাওয়া যায় নি। আর তা ছাড়া, বনমালা নিজেই আমাকে সে দিন বলছিল যে এখানকার চেয়ে আপনার কাছে থাকতেই ওর বেশী ভাল লাগে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চক্ষু দিয়া অশ্রু বহিল। তিনি বলিলেন,—"না না, সে কি কথা মা। আমার বুড়োর কুঁড়ে, সেখানে থাকা কিছুতেই হতে পারে না। সে তোমাকে বোধ হয় রাগ করে বলেছিল। আর এলোই বা সেই বাবুটী। তাঁকে বলবো যে আমার এখানে মাথা গোঁজবার জায়গা নেই বলেই আপনার মেয়েকে আমি ভাল জায়গাতেই রেখে এসেছি।"

হরিমোহিনী বলিলেন,—"আচ্ছা, তবে বনমালাকেই ডাকি।"

বনমালা আসিয়া তাহার পিতার চিঠিখানি পড়িয়া বলিল,—"আমি তো এখানে বেশ আছি মা। বাবাকে বরং লিখে দিন যে সময় পেলেও তাঁর আর ব্যস্ত হয়ে আসবার কোন দরকার নেই।"

হরিমোহিনী বুঝিলেন ইহা অভিমানের কথা। বলিলেন,—"সেটা কি আর হয় মা, তিনিও যে রাগ করে চিঠিখানা লিখেছেন, তা তো বুঝতে পারা যাচ্ছে। সে জন্যেই চক্রবর্ত্তী মশাইকে বলছিলাম আজ হোক, কাল হোক, আর দুদিন পরেই

হোক, তাঁকে আসতেই হবে এটা নিশ্চয়, তা হলে তুমি সে দিন যা বলছিলে, তাই কর না কেন বাছা, এইকটা দিন না হয় চক্রবর্ত্তী মশাইয়ের ওখানে গিয়েই থাক।"

হঠাৎ বনমালার মুখখানির উপর কে যেন কালী ঢালিয়া দিল। কি একটা কথা বলিতে গিয়া হঠাৎ সেটা গলার কাছে আটকাইয়া গেল এবং পরমুহূর্ত্তেই অস্বাভাবিক রকমের গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল,—"হ্যাঁ, সেই ভাল।"

বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বনমালার মনের ভাবটা যে বুঝিলেন না, তাহা নয়। তিনি বলিলেন,—"আমি কিন্তু বলছিলাম মা, কাজ কি আর আমার কুঁড়েয় গিয়ে, সেখানে তো তোমার অসুবিধে বই সুবিধে হবে না, এই খানেই বরং তুমি থাক, তোমার বাবা যদি আসেন, তা হলে সমস্ত বুঝিয়ে বলে তাঁকে এই খানেই আমি নিয়ে আসবো।"

বনমালা পূর্ব্ববৎ ভারি গলায় বলিল,—"না, আমি আপনার ওখানেই বেশ থাকতে পারবো। আমার আবার কষ্টটা কি, যে তারই জন্যে আপনি ভাবছেন?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"তবে তাই হবে মা, তুমি নিজে যখন বলছো, তখন আর আমার অন্য কথা নেই। তা হলে কাল দুপুর বেলা, দুটী খাওয়া দাওয়া করে গরুর গাড়ী করে আমরা দুই মায়ে পোয়ে রওনা হব। কি বল মা!"

বনমালার মুখের ভাব কিছু মাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না। সে বলিল,—"কেন? আজ রাত্তিরে বেরুলেও তো বিশেষ কোন অসুবিধে হোত না।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মৃদু হাসিলেন।

হরিমোহিনী বলিলেন,—"দেখ বাছা! আমার কাছে লুকিও না। কিন্তু আমি তো তোমাকে রাগ করবার মত কিছুই বলিনি। তুমি তো মা সেদিন নিজেই এই কথা বলছিলে।"

বনমালা কিছুই বলিল না। হরিমোহিনী দেখিলেন যে তাহার চক্ষুপ্রান্ত দিয়া একবিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল।

হরিমোহিনী বলিলেন,—"তুমি মনে কষ্ট পাবে জানলে আমি একথা তুলতাম না। আচ্ছা মা! কাজ নেই। চক্রবর্ত্তী মশাই যা বলছেন তাই ভাল, তোমার বাপ এলে তাকে এখানে নিয়ে আসাই ভাল। তিনি যদি সেই পশ্চিম থেকে এতদূর আসতে পারে, তাহলে শ্রাকন্দপোতা থেকে মোক্তারপুরে আসতেও তাঁর খুব কষ্ট হবে না।"

কিন্তু বনমালা রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"না মা! তা হবে না, আমার সকল অপরাধের মার্জ্জনা কোরো মা, আমাকে এ বাড়ী থেকে যেতেই হবে।" এই বলিয়া আর দ্বিতীয় কোন কথা উচ্চারণ না করিয়া ত্বরিতপদে চলিয়া গেল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও হরিমোহিনী উভয়ে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। বিস্ময়ের প্রথম বেগটা কাটিয়া গেলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"মা! স্ত্রীলোকের মন——ওর ভেতরকার কল-কব্জাগুলো বড়ই জটিল। যদি গোড়ায় ঠিক জায়গাটী থেকে চলে তাহ'লে অতি সোজাসুজিভাবেই ওকে চালান যায়। কিন্তু যদি গোড়ায় এতটুকু বিপর্য্যয় ঘটে, তাহ'লে আর মুস্কিলের অবধি নেই মা! তখন রাগই বল, আর হাসিই বল, আর চোখের জলই বল, কোন ব্যাপারটীরই কোন মীমাংসাই করতে পারা যায় না। ওই মন নিয়েই যে ওদের কারবার মা!"

২২

মোক্তারপুর হইতে চলিয়া আসিয়াও বনমালা মনের মধ্যে এতটুকু শান্তি অনুভব করিতে পারিল না। ভবিষ্যতের দিকটা কল্পনার চক্ষে যতই সে দেখিতে লাগিল, ততই তাহা যেন আরও বেশী অন্ধকার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

দুই তিন দিন কাটিয়া গেলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"মা! আমার কুঁড়েয় যদি কোন অসুবিধা হবে ব'লে মনে কর, তা'হলে পাশের ঐ শ্রীরাম ঘোষের বাড়ীতেই না হয়

বন্দোবস্ত ক'রে দিই। কি বল মা! পাড়ার পাঁচটা কথার চেয়ে——"

কিন্তু বনমালা বলিল,—"না, আমি এখানেই থাকবো।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইতঃস্তত করিবার প্রকৃত কারণটী বিবৃত করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বনমালার চোখের দিকে চাহিবা-মাত্রই তাঁহার সব গোলমাল হইয়া গেল। বলিলেন,—"আচ্ছা মা! তাই হবে, তোমার যদি ইচ্ছে না হয় তাহ'লে কাজ কি মা! তুমি আমার এখানেই থাক।"

এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, কিন্তু সিদ্ধেশ্বরবাবুর কোন সংবাদ বা অন্য কোন পত্রও পাওয়া গেল না। রোজ সন্ধ্যাকালে চক্রবর্ত্তী মহাশয় সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া স্থানীয় পিন্‌টার কার্য্য-শৈথিল্য সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ দিয়া জানাইতেন যে এমন অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে পত্র আসিলেও সে ব্যক্তি পাঁচ সাত দিন উহা নিজের নিকটে রাখিয়া তবে তাহা বিলি করিয়াছে, সুতরাং এ ক্ষেত্রেও সেরূপ হওয়ার অসম্ভবনীয়তা কিছুই নাই। কিন্তু দেখা যাইত যে চক্রবর্ত্তী মহাশয় যতই উৎসাহের সহিত সেই বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন, বনমালা ততোধিক উৎসাহের সহিত তাঁহার সমস্ত কথাগুলিকে চাপা দিয়া জানাইত যে—সম্প্রতি পুকুরে জল খুব বেশী বাড়িয়া উঠিয়াছে, বাড়ীর পাতকুয়াটী একবার ঝালাইয়া না ফেলিলে

জল তোলা বড়ই মুস্কিল হইবে, কুয়ার দড়ীটা আর না বদলাইলে চলে না, ইত্যাদি ইত্যাদি—

কিন্তু এই সকল কথাগুলির অন্তরালে যে অভিমানের একটী ধারা প্রচ্ছন্নভাবে বহিতেছিল, সেটুকু চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে না বুঝিতেন তাহা নয়। তিনি বলিতেন,—"মা! বাপমার ওপরে অভিমান করতে নেই। তোমার বাবা যে এলেন না, কিম্বা কোন চিঠিপত্র লিখলেন না, এর মধ্যে নিশ্চই কোন না কোন কারণ আছে। হয় তো চিঠির গোলমাল হ'য়ে গিয়েছে, কিম্বা না হয় তোমার মার অসুখটা বেড়ে উঠেছে তাই আসতে পাল্লেন না। কিন্তু তোমার শ্বশুর মশাই বিস্তৃত ক'রে তাঁকে পত্র লিখলেও, এটা নিশ্চয় জেনো যে তোমার মা বাবা কিছুতেই তোমাকে ফেলে দিতে পারবেন না।"

বনমালা কোন কথা কহিত না। কিন্তু নিঃশ্বাসের শব্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শুনিতে পাইতেন।

সেদিন সন্ধ্যার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আহারে বসিয়াছেন, একটু তফাতে বসিয়া বাতাস করিতে করিতে বনমালা তাঁহাকে বলিল,—"আচ্ছা বাবা! শ্বশুর বাড়ীতে কি আর একেবারেই আমার স্থান নেই?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"সেকথা বলা শক্ত মা। ধর্ম্মের বন্ধনটা সামাজিক বন্ধনের চেয়ে বড়

এটা যদি মেনে নেওয়া যায়, তা'হলে তোমার শ্বশুর বাড়ীতে কেবল স্থান কেন? সেখানে তোমার পূরো দখল আছে। কিন্তু মা! আজকাল যে সমাজটাই বড় হ'য়ে উঠেছে।"

"তাহ'লে আমার স্থান কোথায় বলুন? বাপমাও যদি আশ্রয় না দেন, শ্বশুর বাড়ীতেও যদি স্থান না মেলে, তাহ'লে আমাদের মাথা গোঁজবার জায়গা কোথায় বলুন? কেবল আমার নিজের কথা বল্‌ছিনে, আমার তবু বাপ-মা বেঁচে র'য়েছেন, তাঁহারা আশ্রয় দেন কিম্বা না দেন, সে কথা আলাদা, কিন্তু যাদের বাপ-মা নেই, তাদের যদি আমার মত অবস্থায় পড়তে হয়, তাহ'লে তাদের কি উপায় হবে বলুন তো? সকলের কপালে তো আর আপনার মত দেবতার আশ্রয় মেলে না!"

চক্রবর্ত্তী অনেক ভাবিয়াও এ সমস্যায় কিছু উত্তর দিতে পারিলেন না। শেষে বলিলেন,—"এ রকম স্থলে আমাদের ভবিতব্য বা অদৃষ্ট মেনে নেওয়া ছাড়া তো অন্য পথ দেখিনে। তবে আমার সাদা বুদ্ধিতে যেটুকু বুঝি, তাতে আমার বোধ হয় যে বিবাহের পর থেকে স্বামীর ঘরই স্ত্রীলোকের একমাত্র আশ্রয়, তা ছাড়া আর দ্বিতীয় আশ্রয় এ জগতে কোথাও নেই, অন্ততঃ হিন্দু-সমাজের মধ্যে আর কোথাও নেই। জোর বল, আবদার বল, সবই সেইখানে মা!"

বনমালার সর্ব্বশরীরের ভিতর দিয়া যেন হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে শিহরিয়া উঠিল, আর কোন কথা কহিল না।

রাধানাথের সহিত পুঁটীর বিবাহের জনরবটা এপাড়ায় খুবই রাষ্ট্র হইয়াছিল। দিন স্থিরও এতদিন হইয়া যাইত, কেবল বিবাহ ব্যাপারটী কোথা হইতে হইবে তাহা লইয়াই একটু তর্ক উঠিয়াছিল বলিয়া তাহা হয় নাই। পুঁটীর মার ইচ্ছা ছিল যে বিবাহকার্য্যটা আকন্দপোতা হইতেই হয়, কিন্তু হরিমোহিনী সে প্রস্তাবের অনেকগুলি অসুবিধার তালিকা দিয়া তাঁহার বেগুনফুলকে জানাইয়াছিলেন যে নানাকারণে তাহা অসম্ভব। সুতরাং স্থির হইল যে মোক্তারপুর হইতে প্রায় ক্রোশখানেক দূরে একটী গ্রামে হরিমোহিনীর এক আত্মীয়ের বাড়ী আছে, সেইখানে পুঁটীর মা আসিবেন এবং পুঁটীকেও সেখানে পাঠান হইবে। বিবাহটী সেইস্থান হইতে হইলে অসুবিধার আর কোন কারণ থাকিবে না।

ব্যাপাটী যখন পাকা হইয়া গেল, তখন একদিন সকালবেলা চক্রবর্ত্তী মহাশয় একখানি চিঠি হাতে লইয়া আসিয়া বনমালাকে বলিলেন,—"পুঁটুর বিয়ে তো দেখছি এই সোমবারেই স্থির হ'য়েছে, হরিমোহিনী কেবল যে আমাকে নেমন্তন্নর চিঠি পাঠিয়েছেন তা নয়, তোমাকে নিয়ে যাবার জন্মে গরুর গাড়ী

পাঠিয়েছেন, মোক্ষদা ঝিকেও পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই পড়ে দেখ না চিঠিখানা! আমাকে লিখেছেন যে কেবল নেমন্তন্ন খেতে এলে চলবে না, কোমর বেঁধে রান্নাঘরে বসতে হবে। হা—হা—হা—হা—মা! দেখ এখনও মেয়েটা এই বুড়োর রান্নার ক্ষমতার কথাটা ভুলতে পারে নি। এই যে মোক্ষদা. আয় মা বোস! হাত পা ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হও বাছা, তারপর কথাবার্ত্তা শোনা যাবে।"

বনমালা চিঠিখানা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হাতে দিয়া বলিলেন, —"আজ তো হোল বুধবার, এখনও চা'র পাঁচ দিন দেরী: আপনি কবে যাচ্ছেন কাকা'বু?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"দুঃখের কথা আর বল কেন মা! যে যেটাকে ভয় করে. সেইটেই দেখতে পাই যে আরও যেন জড়িয়ে ধরে। আদালতগুলোকে আমার যমালয়ের চেয়েও ভয়, কিন্তু ঘটনাচক্রটি দেখ মা! সেদিন যাচ্ছিলাম মাঠের ধারে. ওপাড়ার চাটুয্যেদের গোমস্তার সঙ্গে একটা লোকের ঝগড়া বেধেছিল। তাই নিয়ে এক মোকর্দ্দমা বেধেছে, চাটুয্যেরা আর সাক্ষী মানবার লোক খুঁজে পেলে না ভারতবর্ষে, আমাকেই মেনে বসলো। তাদের মোকর্দ্দমাটা হচ্ছে শুক্রবারে। কাজেই আমাকে শুক্রবারের ভোরবেলাই রওনা হ'তে হবে। শুক্রবারে আদালত থেকে ফিরে, সেদিন

আর যেতে পারবো না, শনিবার সকালবেলাই আমি গিয়ে পৌঁছুব। তুমি হরিমোহিনীকে বুঝিয়ে বোলো মা! তুইও বলিস মোক্ষদা, যে নন্দ চক্কোত্তী কেবল নেমন্তন্ন খেতে আসবার বান্দা নয়, কি করবো দায়ে পড়েই এই বিলম্বটা, তা নইলে হরিমোহিনীর দেওরপোর সঙ্গে আমাদের শ্রীরাম ঘোষের নাতনীর বিয়ে, এতে কি আর আমি চুপ করে বসে থাকি।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথার উত্তরে বনমালা তখন কিছু বলিল না বটে, কিন্তু খানিক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল,—"আচ্ছা বাবা! আমার যাওয়ার দরকারটা যে কি তাতো বুঝছিনে। নাইবা গেলুম আমি।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"সেকি হয় মা! তুমি হরিমোহিনীর সম্বন্ধে যাই ভাব না কেন, কিন্তু এটা জেনো যে তিনি যথার্থই তোমার মঙ্গল কামনা করেন। তিনি এত করে চিঠি লিখেছেন, শুধু চিঠি লিখেছেন তা নয়, আবার গাড়ী পাঠিয়েছেন, সেই সঙ্গে মোক্ষদাকেও পাঠিয়েছেন, এস্থলে না গেলে যে কেবল তাঁকেই অসম্মান করা হবে তা নয়, নিজেকেও বড় খাটো ব'লে পরিচয় দেওয়া হবে। সেটা কি করা উচিত?"

বনমালা আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ বলিল,—"আচ্ছা বাবা! যদি আমি আবার শ্বশুর বাড়ীতেই ফিরে যাই, তাহ'লে কি সত্যি সত্যিই তাঁরা তাড়িয়ে দেবেন?"

চক্রবর্ত্তী হাসিলেন। বলিলেন,—"সেদিনও তো এই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলে। তোমার অধিকারটুকু অবশ্য কেউ নিতে পারবে না, কিন্তু সমাজ-বন্ধনের বেলা তো জোর করে বল্‌তে পারা যায় না মা!"

বনমালা একটু দৃঢ়স্বরে বলিল,—"যদি আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী হই, যদি আমার মনে কোন পাপ না থাকে, তাহ'লেও পারা যায় না?"

চক্রবর্ত্তী নীরব হইলেন। তারপর বলিলেন,—"সেটা নিজের মনের জোরের উপর নির্ভর করে মা! ওর জন্যে কোন বাঁধা আইন আছে ব'লে তো আমার মনে হয় না।"

বনমালা বলিল,—"দেখুন বাবা! আপনি আমার জন্যে যতটুকু ক'রেছেন,আমার জীবন দিলেও তার শোধ হয় না। কিন্তু আজ একটা আবদার আপনার কাছে করবো। বলুন রাখবেন?"

চক্রবর্ত্তী বিস্মিত হইয়া বনমালার মুখের দিকে চাহিলেন। সে বলিল,—"যেদিন মনের ঘৃণায় গঙ্গায় ডুবে মরতে যাচ্ছিলাম, সেদিন আমাকে মরণের মুখ থেকে আপনি বাঁচিয়েছেন, মরে শান্তি পেতুম কিনা ভগবান জানেন। কিন্তু বেঁচেও যে মনটার মধ্যে খুব বেশী শান্তি পেয়েছি তাতো মনে হয় না। আপনি আমার একটা কথা রাখুন, আমাকে আবার সেইখানেই রেখে আসুন।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন,—"এ কথার আপত্তি করবার অধিকার আমার নেই মা! কিন্তু সেখানে যদি তাঁরা তোমাকে রাখতে রাজি না হন।"

বনমালা বলিল,—"তখন ভগবানের বিধানই মাথা পেতে নেব। এইভাবে আমার জীবনটা কতদূর চলে তাই দেখতে হবে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ধীরে ধীরে বলিলেন,—"সেইটেই কি ভাল মা!"

বনমালাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"তা বেশ, ওবাড়ীর বিয়ের ব্যাপারটা চুকে যাক, আর তোমার বাবার কোন চিঠিপত্র আসে কিনা দেখি, কাল্‌কে বরং তাঁকে আর একখানা চিঠি লিখে দিই যে—"

বনমালা হঠাৎ বাধা দিয়া বলিল,—"না—না, আর চিঠি আপনি লিখবেন না। শুধু শুধু আর তাঁকে বিরক্ত ক'রে লাভ কি? তিনি যদি আসতেন, তাহ'লে আপনার প্রথম চিঠিখানা পেয়েই আসতেন।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"না, তবু—"

"এর মধ্যে আর তবু নেই বাবা! তিনি যখন তাঁর মেয়ের চেয়ে রাগটাকেই বড় ব'লে মেনে নিলেন, তখন তাঁর মানা না মানার উপর হাত দিয়ে আর কি লাভ হবে বলুন? আর ওবাড়ীর বিয়ের কথা ব'লছেন, আমি সেখানে যাব না।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে বলিলেন, "সেকি কথা মা! সেখানে তুমি যাবে না! না যাওয়াটা কি ভাল দেখাবে?"

বনমালা হঠাৎ খুব গম্ভীর হইয়া বলিল,—"দেখাবে। কোন বিশেষ কারণই বলুন আর যাই বলুন, সে বাড়ীতে আমার আর যাওয়া হবে না।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনে যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন,—"যা ভাল বোঝ কর মা! আমার বলবার এতে কিছুই নেই। মোক্ষদা তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যেই এসেছে, তাহ'লে ওকে ফিরিয়ে দাও। আমি মোকর্দ্দমাটার কাজ সেরে শনিবারেই যাব। আমি তো মা না গিয়ে কিছুতেই পার্ব্বো না।"

বনমালা বলিল,—মোকর্দ্দামা কর্ত্তে আপনি তো যাবেন পরশু সকালে, কাল সকাল কি আমাকে বাবুগঞ্জে নিয়ে যেতে আপনার অসুবিধে হবে?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মুখখানা আরও ভারী করিয়া বলিলেন, —"বেশ তাই হবে।"

২৩

মোক্ষদা ঝি আসল কথাটা কিছুই জানিত না, কিন্তু সে মোক্তারপুরে আসিয়া যখন জানাইল যে চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও বনমালা উভয়ের মধ্যে কেহই আসে নাই এবং তাঁহারা দুজনেই অন্য কোথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তখন হরি-

মোহিনী ও রাধানাথ উভয়েরই বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

রাধানাথ বলিল,—"তাহ'লে জেঠাইমা, আমাকেই দেখছি এখনিই তোমার বাপের বাড়ীর দেশে রওনা হ'তে হয়। তাঁদের দু'জনের মধ্যে একজনও যে এখানে আসবেন না, —অথচ অন্য কোথাও যাবেন, এর মানেটা তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা!"

হরিমোহিনীর মনে হইল হয়তো তাহাকে এবাড়ী হইতে নির্মমভাবে যাইতে বলা হইয়াছিল, সেই অভিমানেই বোধ হয় বনমালা আসিল না, কিন্তু এ অভিমানটাও যে কতখানি যুক্তি-সঙ্গত তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

রাধানাথ বলিল,—"আচ্ছা মোক্ষদা! কোথায় তাঁরা যাচ্ছেন, সেটাও শুনে আসতে পারলি নে।"

মোক্ষদা সে সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে রাধানাথ বলিল,—"তাহ'লে আমি তো আর কিছুতেই দেরী করতে পারিনে জেঠাইমা!"

হরিমোহিনী বলিলেন,—"এখন গিয়েই বা কি লাভ হবে বাবা! তাঁরা তো সকালেই চলে গিয়েছেন শুনছি।"

"হ্যাঁ, কিন্তু খবরটা তো সব জানতে পারবো। তারপর তাঁরা যেখানে গিয়েছেন সেইখানেই না হয়—"

হরিমোহিনী বলিলেন,—"বলিস কিরে রাধানাথ! তুই কি পাগল হ'লি নাকি? তাঁদের যেখানে ইচ্ছে তাঁরা যান, আমার কাজ আমি ক'রেছি, তাঁদের কাজ তাঁরা করুন গে।"

রাধানাথ বলিল,—"সেটা কিছুতেই হ'তে পারে না জেঠাইমা! যেখানে তারা গিয়েছেন, সেখানে পর্য্যন্ত যাওয়ার কল্পনাটা ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু একবার খবরটা না জেনে আমি কিছুতেই সুস্থির হ'তে পাচ্ছি নে।"

হরিমোহিনী বলিলেন,—"তবে তাই হোক। তুমি আকন্দপোতা থেকেই ফিরে এস।"

রাধানাথ চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু হরিমোহিনী কি ভাবিয়া তাহাকে ডাকিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা রাধু! আমার কাছে মিথ্যেকথা ব'লে লুকুতে চাসনে বাছা! সত্যি ক'রে বল দিকিনি, বনমালার সঙ্গে তোর আগে কি রকমের আলাপটা ছিল।"

রাধানাথ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। এই কথাটার মধ্যে যে একটা তীব্র খোঁচা ছিল, সেটা যেন বেশী করিয়াই তাহাকে সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে আঘাত করিল। রাধানাথ উত্তর দিবার হঠাৎ কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না, চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিমোহিনী বলিলেন,—"কথা কচ্ছিস্ নে যে রাধু!"

রাধানাথ মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিয়া বলিল,—"আমি যখন পশ্চিমে গিয়েছিলুম, সেই সময়ে—"

"সেই সময়ে কি হ'য়েছিল ?"

"সেই সময়ে একদিন ওঁদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমার শরীর অসুস্থ ছিল, তারপর ওঁদের বাড়ীতেই গিয়েই জ্বর হয়,—"

"থামলি কেন, তারপর ?"

"আমার সেই অসুখ অবস্থায় ওঁরা খুব সেবা যত্ন ক'রে আমাকে ভাল করেন।"

রাধানাথ আবার থামিল। হরিমোহিনী আবার বলিলেন, —"তারপর।"

রাধানাথ বলিল,—"তারপর আর কি ? সেই সময়ে পরিচয় হ'য়েছিল।"

হরিমোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ ছাড়া আর কোথাও দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।"

রাধানাথ এবার বড়ই সমস্যায় পড়িল। বনমালার প্রকৃত ব্যাপারটী—অন্ততঃ বাবুগঞ্জে তাহার ডাক্তার বেশে থাকিবার কথাটা হরিমোহিনীর নিকটে প্রকাশ করিয়াছে কিনা, তাহা সে জানিত না, সুতরাং হরিমোহিনীর প্রশ্নের উত্তর দিতে বড়ই সঙ্কোচ অনুভব করিতে লাগিল।

কিন্তু হরিমোহিনীর দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে সে মিথ্যা জানাইল যে বনমালার সহিত অন্যত্র আর তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

কিন্তু তথাপি তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা রাধানাথ! মেয়েটা তোকে কি বলে ডাকতো?"

রাধানাথের বক্ষের ভিতরটা হঠাৎ যেন কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সে আর মুহূর্ত্তমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া বলিল,—"দাদা বলে ডাকতো।"

"আর তুই।"

"দিদি বলতুম।" এই বলিয়াই রাধানাথ ত্বরিতপদে বাহিরে চলিয়া আসিল।

রাধানাথের কথা শুনিয়া হরিমোহিনীর ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসির রেখা দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল, সেটুকু আর রাধানাথ লক্ষ্য করিল না।

২৪

অপরাহ্নে আকন্দপোতায় আসিয়া রাধানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও বনমালার অনেক খোঁজ করিল, কিন্তু ফলে বিশেষ কিছুই হইল না।

পাশের বাড়ী অর্থাৎ শ্রীরাম ঘোষের বাটী অর্থাৎ রাধানাথের ভাবী শ্বশুরালয়, তাহার বহির্দ্বারে চাবি বন্ধ, বাড়ীর সমস্ত লোক

বিবাহোপলক্ষে কন্যাপক্ষীয়দিগের জন্য যেস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেইখানেই চলিয়া গিয়াছিলেন। বাড়ীর সম্মুখে একঘর কামার থাকিত, তাহাদের একব্যক্তি জানাইল যে প্রাতে গোবর্দ্ধন ঘোষের গাড়ী আনাইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও সেই মেয়েটী বাড়ীতে চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কোথায় যে গিয়াছেন, সে সংবাদ সে ব্যক্তি দিতে অপারগ।

গোবর্দ্ধন ঘোষের বাড়ী যাইয়া সন্ধান লইয়া জানা গেল যে সে ব্যক্তি এখনও গাড়ী লইয়া বাড়ী ফিরে নাই। সুতরাং ইঁহারা যে কোথায় গেলেন, তাহা অনেক ভাবিয়াও রাধানাথ নির্ণয় করিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে সিদ্ধেশ্বরবাবু আসিয়া তাঁহার কন্যাকে লইয়া গিয়াছেন কিনা, সে সম্বন্ধে কামারদের সেই ব্যক্তিটীকে অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াও রাধানাথ কিছু স্থির করিতে পারিল না, তবে হয়তো তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া, কিম্বা তাঁহার অসুস্থ-তার সংবাদ শুনিয়া বনমালা নিজেই তাহার পিতার নিকট চলিয়া গিয়াছে এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও তাহার সঙ্গী হইয়াছেন, এই ধারণাগুলি ক্রমেই তাহার মনের ভিতর কেমন তোলপাড় করিতে লাগিল।

এই ধারণাগুলির বশবর্ত্তী হইয়া সে একবার রেলওয়ে ষ্টেশনে খোঁজ লইতে মনস্থ করিল, কিন্তু আড়াই ক্রোশ রাস্তা

হাঁটিয়া ষ্টেশনে আসিয়াও তাহাকে হতাশ হইতে হইল। ষ্টেশনের যিনি বুকিংক্লার্ক ছিলেন, তিনি জানাইলেন যে দিনের বেলায় সমস্ত ট্রেণের সময়ই তিনি স্বয়ং টিকিট বিক্রয় করিয়াছেন এবং আকন্দপোতার নন্দ চক্কোত্তীকে তিনি উত্তমরূপে চিনেন, তিনি যে কোন স্থানের টিকিট লন নাই, সেকথা তিনি হলফ করিয়া বলিতে পারেন।

সমস্যাটা রাধানাথের নিকট ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিল। একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া সে যখন পুনরায় আকন্দ-পোতায় ফিরিয়া আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি হইয়াছে।

কামারদের বাড়ীর সেই বৃদ্ধটি তাহাকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ষ্টেশনেও কোন খবর পেলেন না?"

রাধানাথ ঘাড় নাড়িল।

সে ব্যক্তি বলিল,—"তাহ'লে তো বড়ই ভাবনার কথা দেখতে পাই মশাই! ষ্টেশনেও যদি তাঁরা না গেলেন তাহ'লে আর কোথায় যাবেন?"

রাধানাথ নীরব রহিল। সমস্যাটা যতই গুরুতর হইয়া উঠিতেছিল, তাহার মনটাও ততই চঞ্চল হইতেছিল। সেই ব্যক্তিটি তখন বলিল,—"তাহ'লে, অনুগ্রহ ক'রে যখন এসেছেন,

তখন রাত্তিরটায় আমার কুঁড়েতেই থাকুন। ঘরে গাওয়া ঘি আছে, দু'খানা লুচী ভাজিয়ে দিই। শোবার কষ্ট হ'তে পারে বটে, কিন্তু খাওয়ার কষ্টটা যাতে না হয়, সেটুকু অবিশ্যি সাধ্য-মত চেষ্টা করতে ত্রুটি কর্ব্বো না।"

কিন্তু কোন কথাই রাধানাথের ভাল লাগিতেছিল না। তাহার সমস্ত মনটা যেন তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। বনমালার এই অজ্ঞাত যাত্রার মূল কারণ যে সে নিজেই, একথা যেন কে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বারংবার উচ্চকণ্ঠে বলিতেছিল।

আহারাদির পর বৃদ্ধ কর্ম্মকার চণ্ডীমণ্ডপটীতে রাধানাথের জন্য যে শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিল, রাধানাথ তাহাতে শয়ন করিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিল। অনেকদিন পরে আবার তাহার মনের ভিতরে একটা ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হইল।

কোন সময় বোধ হয় তাহার একটু তন্দ্রা আসিতেছিল, হঠাৎ একটা উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, বহিঃপ্রাঙ্গনে উচ্চকণ্ঠে কে ডাকিতেছে, —"নারান, ঘুমিয়েছ নাকি! ও নারান!"

ভিতর হইতে গৃহস্বামী বলিলেন,—"কে?"

উত্তর হইল,—"আমি। একটা লণ্ঠন নিয়ে এসো দিকিনি।"

ভিতর হইতে গৃহস্বামী পুনরায় বলিলেন,—"কে—চক্কোত্তী মশাই নাকি?"

"হ্যাঁ!"

রাধানাথ মুহূর্তমধ্যে দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিল। বালিশের তলায় দেশলাই ছিল, তদ্দ্বারা একটী টিনের ল্যাম্প জ্বালিয়া বাহিরের উঠানে আসিয়া বলিল,—"চক্কোত্তী মশাই! আপনি!"

আলোটা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চক্ষের উপর পড়াতে তিনি রাধানাথকে হঠাৎ চিনিতে পারিলেন না, বলিলেন, "কে গা?"

গৃহস্বামী নারাণ লণ্ঠন লইয়া সেই সময় বাহিরে আসিয়া বলিল, "পেন্নাম হই, চক্রবর্ত্তী মশাই। এই ইনি যে তোমার খোঁজে সেই বিকেল বেলা থেকে একবার ইষ্টিশান, একবার এখানে, একবার ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন গো। কোথায় ছিলে গো তুমি ঠাকুর, সেই ভোরবেলায় যে বেরিয়েছ—"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাধানাথকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "রাধানাথ নাকি?"

"হ্যাঁ।"

কি একটা কথা তিনি বলিতে যাইতেছিলেন, সেটা যেন তাঁহার মুখের কাছে আসিয়া আটকাইয়া গেল। রাধানাথকে বলিলেন, "এসো এদিকে।"

গরুর গাড়ীখানি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। আলো লইয়া তিনজনে সেখানে গেলেন। চক্রবর্ত্তী

মহাশয় তাঁহার দ্বারের কুলুপটা খুলিয়া, আলোটা পুনরায় গাড়ীর ছইয়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন,—"এসো, নেবে এসো মা!"

রাধানাথের বক্ষের ভিতর যেন সমুদ্রের তরঙ্গ বহিতেছিল। সে বলিল, "গাড়ীর ভেতরে কি—"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাহাকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন।

বনমালা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় লণ্ঠনটি লইয়া বাড়ীর ভিতরে আর একবার যাইয়া বোধ হয় ঘরের আলো জ্বালিয়া আসিলেন। নারান লণ্ঠনটি লইয়া অত্যন্ত কৌতূহলপূর্ণচিত্তে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তাহার বড় ইচ্ছা হইতেছিল যে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভ্রমণের বৃত্তান্তটি শোনে, কিন্তু বৃদ্ধের মুখভাব দেখিয়া তাহার আর সে সাহস হইল না।

রাধানাথও অবাক হইয়া গিয়াছিল। বাড়ীর ভিতরে আসিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় রোয়াকটার উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার সম্মুখে পাথরের মূর্ত্তির মত বনমালা দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধতার পর রাধানাথ বলিল, "আমি বিকেলে এসেছিলাম আপনাদের নিয়ে যেতে। মোক্ষদা ফিরে গেল, আপনারা গেলেন না দেখে আমার নিজেরই লজ্জা হতে

লাগলো যে কেন নিজেই এলাম না। সেই জন্যে তখনিই বেরিয়ে পড়লাম। এখানে এসে দেখি বাড়ীতে চাবি বন্ধ।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখনও নীরব। ঠিক যে ভাবে বসিয়াছিলেন, সেইভাবেই বসিয়া রহিলেন। রাধানাথের কথার উত্তরে কিছুই বলিলেন না।

রাধানাথ বলিতে লাগিল, "তারপর ষ্টেশনে গিয়ে খবর নিলাম। যে বাবুটী টিকিট বেচতেন, তিনি আপনাকে খুব চেনেন বল্লেন. কিন্তু শুনলাম যে ষ্টেশনে আপনারা যান নি। মনটায় বড়ই কষ্ট হতে লাগলো।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখনও পূর্ব্ববৎ বসিয়া। রাধানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা।"

এইবার চক্রবর্ত্তী মহাশয় কথা কহিলেন। বলিলেন "বাবুগঞ্জে।"

"বাবুগঞ্জে ?" রাধানাথ লাফাইয়া উঠিল। বিস্ফারিত নয়নে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। বনমালার দিকে চাহিয়া দেখিল, সেও ঘাড় হেঁট করিয়া চুপটী করিয়া তেমনি নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

রাধানাথ আবার বলিল—"তারপর ?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় শুধু আকাশের দিকে আঙুল দেখাইলেন, কোন কথা কহিলেন না।

ব্যাপারটা রাধানাথের নিকট তখনও প্রহেলিকাবৃত বলিয়া মনে হইতেছিল, সে বলিল, "ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বৃদ্ধের মর্ম্মভেদ করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "বাবা, অনেক ঠেকে তবে শিখতে হয়। শাস্ত্রের বিধান খুব কঠিন তা মানি, দোষের শাস্তি দেবার আইন রয়েছে তাও মানি, কিন্তু সে শাস্তি কি দোষের কমবেশী অনুসারে হবে না? খুন করলে ফাঁসী হয় বটে, কিন্তু তাই বলে সকল অপরাধেরই শাস্তি ফাঁসি নয়।"

রাধানাথ বলিল, "কি বল্‌ছেন?"

নন্দ চক্রবর্ত্তী উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "কি বলছি? সেটা নিজেই যে বুঝতে পাচ্ছিনে বাবা। সামান্য এতটুকু ভুলের জন্য যাদের শাস্তি প্রাণদণ্ডের চেয়েও বেশী, সে সমাজের বিহিত কি বলতে পারো?"

আসল কথাটার আভাষ এইবার রাধানাথের মনে বাজিল। সে বলিল, "এঁকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবার জন্যেই বুঝি বাবুগঞ্জে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর?"

চক্রবর্ত্তীর চক্ষু ফাটিয়া এবার জল বাহির হইল! তিনি

বলিলেন, "শেয়াল কুকুরকে লোকে যেমন করে তাড়িয়ে দেয়, তেমনি করে তাড়িয়ে দিলে।"

রাধানাথের শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত হইল। সে বলিল, "কেন গিয়েছিলেন?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "কেন গিয়েছিলাম? সে কথা আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছো? সেখানে না গিয়ে ও বেচারা আর কোথায় যাবে বাবা? এ বিশ্ব-সংসারে ওর স্থান আর কোথায় আছে?"

একটু থামিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় আবার বলিতে লাগিলেন, "আমরা যে দুই একদিন মাকে আশ্রয় দিয়েছি, সেটা তো কেবল নিজের কর্ত্তব্য বলেই দিয়েছি। কিন্তু আমাদের কুঁড়ের তো ওঁর জোর দখল নেই বাবা। ছেলেবেলায় বাপের বাড়ী, বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ী এ ছাড়া তো স্ত্রীলোকের আপনার বলতে কোন স্থান নেই। আগে সেটা বুঝতে পারিনি তাই মাকে জোর করে রেখে দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে নিজের ভুলটুকু বুঝতে পেরেছি, সেই মুহূর্ত্তেই মাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু অদৃষ্ট আমাদের বিরূপ বাবা।"

রাধানাথের মাথা ঘুরিতেছিল। সে বলিল, "কি বললেন তাঁরা?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "ওঁর শ্বশুর বাড়ী ছিলেন না, শাশুড়ী এক

ঝিকে দিয়ে বলে পাঠালেন যে, যে বৌ একবার বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে, তাকে তাঁর আস্তাকুঁড়েও দাঁড়াতে দিতে পারেন না।"

রাধানাথ নিজের ওষ্ঠ দংশন করিল। মুহূর্ত্ত কাল নীরব থাকিয়া বলিল, "বেশ করেছেন ফিরে এসেছেন। ছিঃ তাঁরা কি মানুষ—" বলিয়াই বনমালার দিকে চাহিবামাত্র সে শিহরিয়া উঠিল। বনমালার দুই শুষ্ক চক্ষু হইতে দুইটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন ঠিকরিয়া বাহির হইয়া বলিতে লাগিল, "তুমিই মানুষ বটে! আমার এ দশা, এ পরিণতি কার জন্য? কে আমার এই সর্ব্বনাশ করিল? তুমি নয় কি?"

রাধানাথ আত্ম-সম্বরণ করিয়া বলিল, "এখন কি করবেন ভাবছেন।"

বৃদ্ধ নন্দ চক্রবর্ত্তী বিহ্বলের মত বসিয়াছিলেন, রাধানাথের কথার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "কাশী যাব বাবা। আমার তো আর কেউ নেই, আপনার বলে গর্ব্ব করবার যা কিছু ছিল সবই তো হারিয়েছি। ভগবান এই বুড়ো বয়সে আমার এই মাটীকে এনে দিয়েছেন, আমি ওঁকে ছেড়ে দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমার কাছ থেকে ওকে ছাড়ান নি। আর ওরও তো আর কেউ নেই বাবা, ওর বাপ খোঁজ নিলেন না, শ্বশুর শাশুড়ী আশ্রয় দিলেন না, তাঁরা ত্যাগ করলেন বলে আমি তো তা

পারিনে। মরণের মুখ থেকে যাকে বাঁচিয়েছি মেরে ফেলবার জন্যে তো নয় বাবা। তাই স্থির করেছি, কাল সকালেই মায়ে পোয়ে বেরিয়ে পড়বো। ওখান থেকে এমনি ওমনিই চলে যেতাম, কিন্তু পৈতৃক শালগ্রামটী রয়েছেন, ভাঙ্গা ফুটো বাসন কোসন যা দুই একখানা আছে, সেগুলোর একটা বিলি ব্যবস্থা করে তারপর যাব বলেই আবার ফিরে এলাম। এসে তোমার সঙ্গেও দেখাটা হলো ভালই হোল।" বলিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া তাঁহার নিজের শয়ন কক্ষটীর দিকে চলিয়া গেলেন। শেষের দিকে তাঁহার গলাটা অত্যন্ত ভারী হইয়া উঠিয়াছিল।

বনমালা তখনও নিশ্চলভাবে সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। রাধানাথ মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, "দিদি।"

বনমালা কথা কহিল না। তেমনি ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাধানাথ আবার বলিল, "আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি সেটা বলে দাও দিদি। তুমি আমাকে ক্ষমা না করলে তো একদিনের জন্যও আমি মনে এতটুকু শান্তি পাব না। আসল ঘটনাটা তো আর কেউ জানে না। তোমার এত দুঃখের মূল যে আমি নিজে এ কথাটা যে আমার বুকের রক্ত আজ তোলপাড় করে দিচ্ছে।"

বনমালা বোধ হয় কাঁদিতেছিল। আঁচল দিয়া চোখ দুটী

মুছিয়া সে বলিল, "আমার অদৃষ্ট তো কেউ নেবে না দাদা। আর নিজের কর্ম্মফল যেটুকু সেটুকু পূর্ণ হবেই। তুমি মনে কোন দুঃখ বা অশান্তি রেখ না। তোমার দোষ কি? দোষ আমার অদৃষ্টের।"

রাধানাথ আবার বলিল, "কাশী না গিয়ে বরং ভগমগপুরে ফিরে যাও না কেন দিদি। আমিই বরং তার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।"

বনমালা বাধা দিয়া বলিল, "না। আমার অদৃষ্টের দুঃখের বোঝার মাঝখানে কতটুকু পুণ্য ছিল জানিনে,যার ফলে চক্রবর্ত্তী মশাইকে পেয়েছি। ভগবান করুন, আমি যেন এঁরই আশ্রয়ে জন্ম জন্ম কাটাতে পারি।" বলিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। রাধানাথ কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধতার পর বনমালা জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে কি এই সোমবারেই।"

রাধানাথ একটু গম্ভীর মুখে বলিল, "হ্যাঁ, তাই স্থির হয়েছিল বটে, কিন্তু আমাকে এখনিই গিয়ে সেটা আপাততঃ বন্ধ করতে হবে।"

বনমালা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "সে কি? কেন?"

"কাশী থেকে ফিরে এসে তারপর যা হয় হবে।"

বনমালা আরও বিস্ময়ের সহিত বলিল, "কে কাশী যাবে? তুমি? কেন?"

রাধানাথ বলিল, "তোমরা দুজনে যে সেখানে গিয়ে অচেনা জায়গায় পাণ্ডার হাতে পড়ে লাঞ্ছনা ভোগ করবে সেটা আমি হতে দেব না। তুমি যখন সেখানে যাবে বলেই স্থির করেছ, তখন তোমার ইচ্ছাকে আর আমি বাধা দেব না। কিন্তু তোমাদের সেখানে পৌঁছে না দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো না।"

বনমালা একটু চঞ্চলভাবে বলিল, "দেখ, একটা কথা বলি, তোমার মনের কথা ভগবানই জানেন, কিন্তু আজ তোমাকে আমি এইটুকু অনুরোধ কচ্ছি যে যদি কখনও এক মুহূর্তের জন্যও আমার এতটুকু মঙ্গল কামনা করে থাক, তা হলে আমার কথা শোন, আর আমার সামনে কখনও এসো না। কাশী গিয়েও যদি একটু শান্তি পেতুম, তাও কি তুমি আমাকে পেতে দেবে না।"

রাধানাথের মনের কপাটে কে যেন হাতুড়ীর ঘা মারিল। সে চমকিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। স্থির অপলক চক্ষে, বনমালার মুখের দিকে আরও কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, "বেশ তাই ভাল। তবে চললুম দিদি। ভগবান করুন, তুমি শান্তি পাও, আর আমি আমার পাপের শাস্তি পাই।" বলিয়া অগ্রসর হইতে গেল।

বনমালা বলিল, "দাঁড়াও" রাধানাথ দাঁড়াইল। বনমালা বলিল "আমার কথায় রাগ কোরো না ভাই। মনের ভেতর বড়ই জ্বালা করছে, তাই তোমাকে বলেছি। আবার বলছি, দোষ তোমারও নয়, আমারও নয়, দোষ আমার অদৃষ্টের। কর্ম্মফল তুমি মান কি না আমি জানি না, কিন্তু আমি খুব মানি।" বলিয়া আবার একটু নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, "পুঁটীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিও, আর তাকে কখনও অযত্ন বা অবহেলা করো না। ভগবান করুন সে যেন তোমাকে সুখী করতে পারে। আমি আর তোমাদের বিয়ের যৌতুক বলে কি দিতে পারি বল দাদা, অনাথিনী আমি, কিন্তু তবু এইটী দিয়ে যাচ্ছি, এই আমার একটী মাত্র দেবার জিনিষ আছে, আর আমি মনে করি যে এর বেশী আর কেউ কিছু দিতে পারে না।" বলিয়া আঁচল হইতে খুলিয়া দুইগাছি সোনার শাঁখা রাধানাথের হাতে দিয়া আবার বলিল, "আজ সে দিনের কথা মনে পড়ছে, আমার স্বামী ঐ দুটী গড়িয়ে লুকিয়ে আমাকে প্রথম উপহার দিয়েছিলেন। এত দুঃখে পড়েও, সব হারিয়েও আমি ঐ দুগাছি রেখে দিয়েছিলাম। আজ আমার বড় আনন্দ যে এই শাঁখা দুগাছি আমি পুঁটুকে দিয়ে যেতে পাচ্ছি। ও কি দাদা, না, না, ঘাড় নাড়লে চলবে না, আমার এই শেষ অনুরোধটুকু তোমাকে রাখতেই হবে ভাই।"

রাধানাথেরও চক্ষে জল আসিয়াছিল। কিন্তু আজ সে বনমালার এই দান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না, হাত পাতিয়া শাঁখা দুইগাছি লইল।

বনমালা বলিল, "জেঠাইমাকে আমার প্রণাম জানিও। আর আজ বিদায় হবার আগে তোমাকেও প্রণাম কচ্ছি। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর দাদা।" বলিয়া বনমালা গলায় আঁচল দিয়া রাধানাথের পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

রাধানাথ স্থির গম্ভীরভাবে আবার বলিল, "কিন্তু আমাকেও একটা উত্তর দিয়ে যাও দিদি। নইলে আমি তো এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পাবো না। বল, তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করলে। তোমার কাছেই আমি সব চেয়ে অপরাধী তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করো, তা হলে আমার বোঝা অনেকটা হাল্‌কা হয়ে যাবে।"

বনমালা বলিল, "দুঃখ কিসের ভাই। ছিঃ মনে এতটুকুও অশান্তি এনো না।"

রাধানাথ আবার বলিল, "তা হলে তুমি আমাকে ক্ষমা করলে, বল।

নতমুখে বনমালা ধীরে ধীরে বলিল, "হ্যাঁ।"

"তবে আসি দিদি।" বলিয়া রাধানাথ আবার অগ্রসর হইল।

বনমালা বলিল, "চক্রবর্ত্তী মশায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবে না।"

রাধানাথ বলিল, "না। তাঁকে আর মুখ দেখাতেও আমার সাহস হয় না।" বলিয়াই ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল।

বনমালা সেই নির্জ্জন অন্ধকার রাত্রিতে চুপ করিয়া আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। এই নিশীথ অন্ধকারের ভিতর দিয়া রাধানাথ যে কি উপায়ে যাইবে সে সমস্যাটাও মনে বার বার আঘাত করিতে লাগিল। একবার ভাবিল, চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ডাকিয়া বলে যে রাধানাথকে ফিরাইয়া আনুন, কিন্তু তাহার সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, সে অবসন্নভাবে সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

সমাপ্ত।

গ্রন্থকার প্রণীত—

অভ্রপুষ্প

বর্ত্তমান সমাজের নয়খানি নিখুঁত ফটো

সিদ্ধিকবচ

সামাজিক উপন্যাস।